Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গণতন্ত্র

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শরীফা সরকার

রোলঃ 230901201612310

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গণতন্ত্র

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শরীফা সরকার

রোলঃ 230901201612310

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ও গণতন্ত্র " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শরীফা সরকার, আইডিঃ 230901201612310 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ও গণতন্ত্র " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

শরীফা সরকার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

শরীফা সরকার

আইডিঃ 230901201612310

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

ইসলাম, ইসলামী শরী'আত ও গণতন্ত্রের পরিচয় 6

গণতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 10

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি 11

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র 12

গণতন্ত্র তুমি কার? 13

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি 14

খেলাফত ব্যবস্থা: নীতি, উদ্দেশ্য ও ইতিহাস 21

সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক কে? 28

সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বনাম কুরআন সুন্নাহের ফয়সালা 32

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শূরার বাস্তব প্রয়োগ 35

শরীঈ শূরা ও সংসদীয় পদ্ধতির পরামর্শনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ 39

শরঈ শূরা ও প্রচলিত গণতান্ত্রিক সংসদীয় পরামর্শ পদ্ধতি অভিন্ন কিনা? 41

ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক কেমন? আকাবিরে উলামায় দেওবন্দের অবস্থানঃ 48

ইসলামী বিধান ও তার ঘোষণাবলী কোনরূপ আবর্তন-বিবর্তন, পরিবর্তন- পরিবর্ধন গ্রহণ করে না 52

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানব রচিত আইনের অসারতা 55

ইসলাম ও গণতন্ত্র: একটি তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 64

গণতন্ত্রকে ইসলামীকরণ বা ইসলামসিদ্ধ করা কি সম্ভব? 91

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটের মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা: একটি পর্যালোচনা 95

ভোট ও তার শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি 108

গণতন্ত্রের বাস্তবতা ও মুসলিম উম্মাহের করণীয় 114

ভূমিকা

পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি।
সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জন্য, যিনি আসমান-যমীনের মালিক, মানবজাতির স্রষ্টা এবং সার্বভৌমত্বের একক অধিকারী। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতি, যিনি মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, আল্লাহর কিতাবের আলোকে জীবন পরিচালনার শিক্ষা দিয়েছেন, যিনি-সকল বাতিল ইলাহকে বর্জন করে এক ইলাহের ইবাদতের দিকে আহবান জানিয়েছেন এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের ওপর।

ইসলাম এসেছিলো এক নতুন উম্মাহর সূচনা করতে। সেই উম্মাহকে আল্লাহ মানবজাতির নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিলেন। অজ্ঞতা ও অন্ধকারের মরুভূমি থেকে মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলো সেই উম্মাহ। মুসলিম উম্মাহ, আমাদের উম্মাহ। ইসলামের সামগ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন করে এক সময় মুসলিম উম্মাহ প্রায় গোটা বিশ্ব বীরদর্পে শাসন করেছে কিন্তু সেই উম্মাহ আজ নিজের নেতৃত্বের দায়িত্ব ভুলে গেছে, তাদের অবস্থা এখন স্রোতে ভাসমান খড়কুটোর ন্যায়। কালক্রমে তারা জেনে বা না জেনে সেই সামগ্রীক ও ব্যাপক চিন্তাধারা থেকে সরে এসে ইসলামকে সংকীর্ণ করে অনুধাবন করা শুরু করেছে। আজ তারা ঐ সব জাতির অনুকরণে ব্যস্ত হয়ে গেছে, যারা নিজেরাই বিভ্রান্ত, আকণ্ঠ আবর্জনায় নিমজ্জিত, ফিতনায় জর্জরিত। ফলশ্রুতিতে এক তীব্র উন্মাদনার কবজায় আটকা পড়ে গেছে।

ইসলাম কোন কাল্পনিক জীবন-ব্যবস্থা নয়। এ থেকে সুফল পেতে হলে একে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। ইসলামী বিধান দাওয়াত, তালীম ও এর প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কখনোই জীবন্ত রূপ ধারণ করে না। একে মানুষের কল্যাণে কার্যকর করা যায় না। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, আজকের দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার দিকটি মারাত্মকভাবে উপেক্ষিত। ফলে অনৈসলামী আইন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির চাপে মুসলিম সমাজ আজ একদিকে যেমন কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহর

বাস্তবায়নেও পিছিয়ে পড়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সূরা আন-নিসা আয়াত নং ৫৯ ও ৮০ এ ইরশাদ করেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول- َ

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করো, আর আনুগত্য করো তাঁর প্রেরিত রাসূলের"।

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله-

অর্থঃ "যারা রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করলো"।

সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ১০৩ এ আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন,

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا

অর্থঃ "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূর আয়াত নং ৫২ এ ইরশাদ করেছেন,

وَ مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَخْشَ اللهَ وَ يَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ َ

অর্থঃ "আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তারাই কৃতকার্য"।

অর্থাৎ, কৃতকার্যতা ও সফলতার যোগ্য একমাত্র সেই সমস্ত লোক, যারা নিজেদের সকল ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের ফায়সালাকে আনন্দচিত্তে মেনে নেয়, আল্লাহ ও রাসূলের

অনুসরণ করে এবং তারা সংযম ও আল্লাহ-ভীতির সকল গুণে গুণান্বিত। তারা সফলতার উপযুক্ত নয়, যারা উক্ত গুণের অধিকারী নয়।

ইসলামের বিশ্বাসসমূহ ও তার সকল তত্ত্ব সর্বদাই চিরন্তন, অপরিবর্তনশীল, পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত । মানুষের মধ্যে তার পরিবেশকে বদলানোর, একে আরও উন্নত করার প্রবণতা কাজ করে। এটিও একটি স্থায়ী বাস্তবতা। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের বানানো জীবনব্যবস্থা কিংবা ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি, সময়, স্থান আর জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মাথায় রেখে। এই সংকীর্ণতা আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় মানুষের অজ্ঞতা, ত্রুটি, সংস্কার আর আবেগ-অনুভূতির কারণে। এই পরিবর্তনের ধারা ক্রমাগত চলতেই থাকে। এই পরিবর্তনের হাত ধরেই
বর্তমানে "গণতন্ত্র নামক ফিতনা" মহামারীর মতো রূপ ধারণ করেছে। বলাবাহুল্য গণতন্ত্র নিছক একটি ফিতনা নয় বরং শত-সহস্র ফিতনার জন্মদাতা, সংক্রামক এক ব্যাধি, যা বর্তমানে মুসলিম উম্মাহের শরীরে রক্তচোষা জোঁকের মতো লেপ্টে আছে। যা কালেমা পড়নেওয়ালা মুসলমানদের জান-মালকে হালাল মনে করে। কুরআনী আইন বাস্তবায়নের দাবী উত্থাপনকারীদের বিদ্রোহী, সন্ত্রাসী বলে। মুসলিম উম্মাহকে গণতন্ত্রের ফাঁদে ফেলে দলতন্ত্রের চোরাবালিতে গণ অধিকার বিলুপ্ত করা হয়েছে।

যুগ চাহিদা ও মানুষের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং নিজ দ্বীনি চেতনাকে বিশুদ্ধ করা, সে চেতনাকে অধিকতর উন্নত,পরিপূর্ণ করার প্রবল আগ্রহ থেকে নিজের থিসিসের বিষয় হিসেবে "ইসলাম ও গণতন্ত্র" নির্বাচন করেছি। সেইসাথে মুসলিম সমাজের তরুণ প্রজন্ম যারা দূরদর্শিতা ও একনিষ্ঠতার সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও দ্বীনের সেবা করতে চান তারা যেন কোনো ব্যক্তি বিশেষকে বা সংগঠনকে নয় বরং একমাত্র সত্যকেই চূড়ান্ত মাপকাঠি বলে বিশ্বাস করে , সীরাতে মুস্তাকিম হতে বিচ্যুতি না হয় সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিয়াতে থিসিস হিসেবে “ইসলাম ও গণতন্ত্র” বিষয়টি বেছে নেওয়া। আল্লাহ কবুল করুন আমিন। নিশ্চয় সাফল্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং সকল প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই।

গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব নীতিগতভাবে জনগণের কিন্তু কার্যত তা জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। সংখ্যাগরিষ্ঠ মতকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়, সংসদে মানুষের ভোটের

মাধ্যমে হালাল হারাম নির্ধারণ করা হয়, এখানে আল্লাহও নেই, রাসূলও নেই, কুরআনও নেই, হাদিসও নেই। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন সূরা ইউসুফ,আয়াত নং ৪০ এ যে إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ অর্থঃ "বিধান দেওয়ার অধিকার তো কেবলমাত্র আল্লাহরই"।

এই ব্যবস্থাকে অনেকে ইসলামী ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়াস করেন। কেউ কেউ দাবি করেন, এটি কেবল শাসন পরিচালনার একটি ধরন ও পদ্ধতি মাত্র। কিন্তু বাস্তব সত্য কথা হলো- এটি ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস বিরোধী। কারণ, ইসলামের প্রথম ভিত্তিই হলো তাওহীদ-যেখানে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিতে হয়। অথচ গণতন্ত্র সেই সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিয়ে জনগণের হাতে তুলে দেয়। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে গণতন্ত্র, ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই ইসলামের সঙ্গে গণতন্ত্রের পট্টি জোড়া দেয়া বা গণতন্ত্রকে ইসলামী রূপ দেয়ার চেষ্টা করা-এ দুটোই চরম ভুল। গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বরং সম্পূর্ণভাবে ইসলাম পরিপন্থী ও পরস্পরবিরোধী। সরল পথ একটাই , দুনিয়ার বুকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার মতো সংবিধান একটাই, তা হলো একমাত্র ইসলামী সংবিধান। এটি অন্তর্দৃষ্টি থাকলে উপলব্ধি করা সহজ, তবে যাদের অন্তর্দৃষ্টিই মৃত্যুবরণ করেছে, বোধশক্তি হারিয়ে গেছে ও চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের কাছে এসব ধোঁয়াশাই মনে হবে। কুরআনুল কারীমে সূরা হাজ্জ আয়াত নং ৪৬ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন;

أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوبٞ يَعۡقِلُونَ بِهَآ أَوۡ ءَاذَانٞ يَسۡمَعُونَ بِهَاۖ فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَلَٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ

অর্থঃ "তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের হতো এমন হৃদয় যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারতো এবং এমন কান যা দ্বারা তারা শুনতে পারতো। বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়"।

গণতন্ত্র এমন এক ফিতনা যেখানে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। আফসোস তো অন্ধ ও বধিরের ওপর নয়; বরং আফসোস সে সকল ব্যক্তির ওপর যারা চোখ থাকা সত্ত্বেও কিছু দেখে না, কান থাকা সত্ত্বেও কিছু শুনেনা। সত্য-মিথ্যা সব কিছুই তাদের কাছে সমান। গণতন্ত্রকে বাহির থেকে দেখতে গেলে মনে হবে এটি অত্যন্ত সুন্দর একটি রঙিন মোনার্ক প্রজাপতি বা ডোরাকাটা রঙিন সাপ অথবা একটি সুশ্রী মাকাল ফল - যা মোহনীয়, কিন্তু ভেতরে ভীষণ বিষাক্ত, দূর্গন্ধযুক্ত তিক্ত যা নৈতিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও ধর্ম-সবকিছুকে দংশন করে ধ্বংস করে দেয়।

এই উম্মাহ যেন এসব দুর্গন্ধময় বিষাক্ত রাজনীতি থেকে বেরিয়ে যেন নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে বর্তমান শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন সাধন করে প্রকৃত ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও রীতিনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন সেই তামান্না রাখি । মহান আল্লাহ সেই তাওফীক আমাদের সবাইকে দিন। আমীন।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের সূরা যুমার, আয়াত নং ১৮ এ ইরশাদ করেছেন,

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ

অর্থঃ "যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান"।

সূরা ক্বমারে আল্লাহ তা'আলা যথাক্রমে ১৭,২২,৩২ ও ৪০ নং আয়াতে চারবার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ-

অর্থঃ "আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?"

সূরা বাকারা, আয়াত নং ২ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿٢﴾

অর্থঃ "এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত"।

ইসলাম, ইসলামী শরী'আত ও গণতন্ত্রের পরিচয়

ইসলামঃ

ইসলাম اَ لْاِ سْلَامُ শব্দের মূল سْلَم অর্থ- শান্তি, স্বেচ্ছায় কারো অনুগত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা, বিনা আপত্তিতে কারো আদেশ-নিষেধ মেনে নেয়া। শরী'আতে ইসলামের অর্থ স্বেচ্ছায় আল্লাহর অনুগত হওয়া বা বিনা আপত্তিতে জীবনের সর্বব্যাপারে তাঁর আদেশ নিষেধকে মেনে নেয়াই হলো ইসলাম।

কুরআনের আলোকে,

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম; আর তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা, আয়াত-৩)

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম"।
(সূরা আল ইমরান, আয়াত-১৯)

হাদিসের আলোকে,
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمَ الصَّلُوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكُوةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

অর্থঃ "ইসলাম হলো- তুমি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। সালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহর হজ্জ আদায় করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

দ্বীন ইসলাম এমন একটি জীবনবিধান যা আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও তাঁর পূর্ণ আনুগত্য দাবী করে। ইসলামের বাস্তব রূপ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর জীবন। তিনি ৪০ বছর বয়স থেকে ৬৩ বছর পর্যন্ত যা করেছেন এর সবটুকুই ইসলাম।ইসলাম তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে কাজ দাবি করে। বারবার তাকে বলতে থাকে, 'উঠে দাঁড়াও! বের হও। তোমার কাজের মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করো ইসলামের শিক্ষা।'

ইসলামী শরী'আতঃ

শরী'আত (الشرية) আরবি শব্দ। যার অর্থ হলো পথ। ইসলামের পরিভাষায় 'শরী'আত' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি অর্থ হলো ধর্ম বিশ্বাস বা বিশ্বাস বিষয়ক মূলনীতিসমূহ।

ইসলামী শরী'আত হলো পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ (রাসূল ﷺ.-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতি) থেকে প্রাপ্ত ইসলামের সামগ্রিক জীবনবিধান, যা মুসলমানদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের নির্দেশিকা । এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে

নির্দেশিত চিরন্তন পথ, যার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের কল্যাণ, পবিত্রতা এবং পরকালীন মুক্তি অর্জন করা ।

ইসলামী শরী'আতের মূল ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। এর বাইরে ইজমা (ওলামাদের শরয়ী বিষয়ে ঐক্যমত হওয়া) এবং কিয়াস (তুলনা/উপমাগত যুক্তি) দ্বারাও আইন প্রণয়ন করা হয়। সুতরাং, শরী'আতের উৎস হলো মোট ৪ টি: কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস। শরী'আতের বিষয়গুলো হলো সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। এখানে অস্পষ্টতা বা অন্ধকারের স্থান নেই। ইবাদত-বন্দেগী থেকে শুরু করে আইন-আদালত, রাষ্ট্রনীতি সব কিছুই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রমাণিত।

গণতন্ত্র(Democracy)

গণতন্ত্র শব্দটি ইংরেজি ভাষায় এসেছে ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসি শব্দ Démocratique থেকে। এই শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক ভাষা থেকে। যা দু'টি শব্দ, Demos এবং Kratos মিলে গঠিত। Demos এর অর্থ হলো, জনসাধারণ(People) আর Kratos এর অর্থ শাসন(Rule)। একত্রে জনগণের শাসন (Rule of the people)

গণতন্ত্র(Democracy) এর সংজ্ঞাঃ

Democracy: Free and equal representation of people. A government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation. involving periodically held free elections.

অনুবাদ: "গণতন্ত্র সকলের অবাধ ও সমান প্রতিনিধিত্ব। এটি এমন এক শাসনব্যবস্থা যাতে শাসনক্ষমতার উৎস হলো জনগণ। জনগণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। এর শাসকগণ মূলত জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। যারা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে

জনগণের মতামত বা রায় নিয়েই নির্বাচিত হন।" (Encarta 2009 Encyclopaedia britannica)

গ্রীক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক হোরোডোটাস বলেন, গণতন্ত্র হলো এমন একটি সরকার যেখানে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা আইনিভাবে পুরো সমাজের হাতে থাকে।

গণতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা-যা অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র কিংবা কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার বিরোধী একটি আদর্শ, যেখানে প্রকৃত ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় জনগণকে।

শাসনব্যবস্থার নীতি, রীতি, আদর্শ ও
মূল্যবোধ নির্ধারণের প্রধান ভিত্তি হয় জনগণের ইচ্ছা ও অংশগ্রহণ। এখানে জনগণই সার্বভৌম, শাসনের অধিকার তাদেরই হাতে ন্যস্ত এবং যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাদের জবাবদিহি করতে হয় জনগণের কাছেই।
-(Encyclopedia of Islam)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ রাষ্ট্রপতি
আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন ১৮৬৩ সালে তার ঐতিহাসিক গেটিসবার্গ বক্তৃতায় (Gettysburg Address)। তিনি গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: " Democracy is a government of the people, by the people, for the people" ।
অর্থঃ "জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার"

Democracy is a universal value based on the freely expressed will of people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives."

অনুবাদঃ "গণতন্ত্র একটি সর্বজনীন মূল্যবোধ যা জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা নির্ধারণের অবাধ ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে গঠিত। [UN General Assembly Resolution 59/201]

গণতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতকে গ্রিসের নগর-রাষ্ট্র গুলো গড়ে ওঠে। এটি ছিলো গণতন্ত্রের প্রাথমিক পরীক্ষাগার।এর মধ্যে অ্যাথেন্স খ্রিষ্টপূর্ব ৫০৮-৫০৭ সালে ক্লিসথেনিসের সংস্কারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরীক্ষা শুরু করে। এই ব্যবস্থায় নাগরিক সভা বা Ekklesia আইন প্রণয়ন করত। তবে নাগরিকত্ব শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; নারী, দাস ও বিদেশিরা বাদ পড়ত।

রোমে খ্রিষ্টপূর্ব ৭৫৩ থেকে ৫০৯ সাল পর্যন্ত রাজতন্ত্র ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০৯ সালে শেষ রাজা তারকুইনিয়াস সুপারবাসকে উৎখাত করে রোমান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি খ্রিষ্টপূর্ব ২৭ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এরপর ১৫০০ বছর ইউরোপে রাজা-বাদশার শাসন চলে। এর মাঝে ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডে ম্যাগনা কার্টা হয়। এতে প্রথমবার রাজার ক্ষমতা কমানো হয়। এটা আধুনিক গণতন্ত্রের বীজ।"

অষ্টাদশ শতকের আলোকায়ন পর্ব গণতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। জন লকের সরকারের সম্মতির তত্ত্ব, মন্টেস্কুর ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি এবং রুশোর সার্বভৌম জনগণের ধারণা আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের পথ তৈরি করে। আমেরিকান বিপ্লব ১৭৭৬ ও ফরাসি বিপ্লব ১৭৮৯-এর মাধ্যমে এই ধারণাগুলোর রাজনৈতিক প্রয়োগ ঘটে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'উদার গণতন্ত্র' বা লিবারেল ডেমোক্রেসি বর্তমান রূপ লাভ করে।

তথ্যসূত্রঃ

[M.H. Hansen, _The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes (Oxford: Blackwell, 1991), 29-34.] ,[Mary Beard, _SPQR: A History of Ancient Rome_ (New York: Liveright, 2015), 131.] , [Ibid., 510.], [J.C. Holt, _Magna Carta_ (Cambridge: Cambridge UP, 2015), 42],

[Lauro Martines, _Power and Imagination: City-States in Renaissance Italy_ (Johns Hopkins UP, 1988).]

অতএব, প্রাচীন গ্রিক রাজনীতিবিদ ক্লিসথেনিস (Cleisthenes) হলো গণতন্ত্রের জনক, খ্রিষ্টপূর্ব ৫০৮-৫০৭ সাল। আধুনিক গণতন্ত্রের জনক ইংরেজ দার্শনিক জন লক (John Locke) [PBS-The Greeks, Encyclopaedia Britannica, Wikipedia, World History Encyclopaedia]

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি

গণতন্ত্রের সর্বজনস্বীকৃত সঙ্গা অনুযায়ী এর মূল ভিত্তি ৩টি:
১.জনগণের সার্বভৌমত্ব (Popular sovereignty)
"Democracy, literally, rule by the people" — আক্ষরিক অর্থে জনগণের শাসন। [Encyclopedia Britannica]
সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হাতে (Supreme power is vested in the people) [Merriam-Webster]

২.সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন (Rule of the majority) [Merriam-Webster]

৩. জনগণের অবাধ ইচ্ছা / জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত (Freely expressed will of people to determine their own systems)
[United Nations Resolution 59/201]

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র

Secular ল্যাটিন শব্দ saeculum থেকে এসেছে। যার অর্থ "পার্থিব", ইহজাগতিকতা, ধর্মনিরপেক্ষ।

ism = মতবাদ, বিশ্বাস, নীতি।

দুটো একত্রে করলে অর্থ দাঁড়ায় Secularism=ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

"Secularism: The principle of separation of the state from religious institutions."

[Oxford Dictionary of Politics]

অনুবাদঃ "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ: রাষ্ট্রকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক রাখার নীতি।"

"Secularism, any movement in society directed away from otherworldliness to life on earth... separation of religion from civic affairs and the state. [Encyclopedia Britannica]

অর্থঃ "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো এমন আন্দোলন যা রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক বিষয় থেকে ধর্মকে আলাদা করে।"

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) হলো এমন একটি মতবাদ যা রাষ্ট্র বা সরকারি কর্মকাণ্ড থেকে ধর্মকে পৃথক রাখার নীতি সমর্থন করে।

পক্ষান্তরে Demos এর অর্থ হলো, জনসাধারণ(People) আর Kratos এর অর্থ শাসন(Rule)। গণতন্ত্র হলো মৌলিকভাবে জনগণের শাসন । যার মূলমন্ত্র জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। এই ব্যবস্থায় ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, এখানে ধর্ম রাজনীতি বিবর্জিত। ব্যক্তিগতভাবে এতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা স্বীকৃত। কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে ধর্মের কোন প্রবেশাধিকার স্বীকার করা হয় না। এখানে জনগণের প্রতিনিধিরা যে আইন পাশ করে সে আইন আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী হলেও জনগণ তা মানতে বাধ্য হয়। সংসদে আইন রচনা করার সময় আইন রচনাকারীরা এটা দেখে না যে, আমরা যে আইন রচনা করছি তা আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (ﷺ) সুন্নাহ্ সম্মত নাকি তার বিরোধী। এসব দেখতে তারা বাধ্য নয়।

সুতরাং উপরোল্লিখিত দুটো সঙ্গা থেকে বোঝা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরা একে অপরকে ধারণ করে আছে। উভয়ের ই মূল বক্তব্য হচ্ছে, আইন-আদালত, বিচারকার্য এসব চলবে রাষ্ট্রীয় নীতি ও জনগণের চাহিদা অনুযায়ী। রাষ্ট্র যেভাবে আইন করে সেভাবে চলবে। ধর্মের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।

গণতন্ত্র তুমি কার?

যারা মুসলিমদের জাতশত্রু ,যাদের লক্ষ্য ইসলামী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা রোধ করা, ইসলামী শরী'আত যেন ফিরে আসতে না পারে তা নিশ্চিত করা, তারাই হলো গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক, গণতন্ত্র শুধুমাত্র তাদের। গণতন্ত্রে মানুষকে গণনা করা হয়, ওজন করা হয়না। নিঃসন্দেহে এটি পাশ্চাত্যের উপহার। কস্মিনকালেও গণতন্ত্র তাওহীদে বিশ্বাসীদের হতে পারেনা। কিভাবেই বা সম্ভব হতে পারে? তাওহীদে বিশ্বাসীরা তো এক আল্লাহ ছাড়া কখনোই অন্য কোনো কিছুর গোলামি করেনা। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির বিশ্বাসঘাতকতা আদৌ কি মানানসই? না কখনোই না। গণতন্ত্র তো নিজেই নিজের নামের সাথেও চরম ধোঁকাবাজি প্রতারণা করার দ্বারা নিজের গায়েই কলঙ্কের দাগ লেপে নিয়েছে, কেননা গণতন্ত্রে জনগণকে যতই সকল ক্ষমতার উৎস বলা হোক না কেন, বাস্তবে ইসলামী শরী'আতের বিরোধীতাকারী অপশক্তিদের কাছে জনগণ ও জনগণের রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল্যহীন, তাদের ভেড়া বকরীর মতো অনবরত হাঁকিয়ে নেওয়া হয় এবং ছলেবলে কৌশলে তারা বাস্তবায়ন করে নিজস্ব এজেন্ডাসমূহ । এমন প্রতারণামূলক তন্ত্র মন্ত্র কখনোই তাওহীদে বিশ্বাসী ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুসারীদের হতে পারেনা।

পূর্ববর্তী আলোচনায় গণতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, গণতন্ত্র মূলত কার হাত ধরে বিকশিত হয়েছে এবং কারা এই গণতন্ত্র নামক পতাকার পতাকাবাহী!

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি

“Islam is a Universal religion." ইসলাম একটি শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। যা বাস্তবসম্মত এবং মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শুধু ইসলামী জীবনব্যবস্থাতেই মানুষ একই সাথে দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য বাঁচতে পারে। দ্বীন ইসলাম নাযিল হয়েছে এক বিশেষ ধরনের উম্মাহ গড়ে তোলার জন্য। এমন এক উম্মাহ, যা মানবজাতিকে আলোর পথ দেখাবে, মহান আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে পৃথিবীতে। এই উম্মাহ মানবজাতিকে মুক্ত করবে বিচ্যুতি, পথভ্রষ্টতা, কলুষিত নেতৃত্ব, মিথ্যে আদর্শ আর মতাদর্শের কবল থেকে।

একটি পরিপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত জীবনবিধান হিসাবে ইসলামের আইন সর্বযুগে ও সর্বসময়ে প্রয়োগযোগ্য। পবিত্র আল-কুরআন ও আল-হাদীস এর মূল, ইজমা ও কিয়াসের প্রয়োগ একে আরও জীবন্ত করেছে। ইসলামী আইন ইসলামী শরী’আতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী আইন বা শরী’আত ইসলামের মৌল দর্শন ও নীতিমালারই পূর্ণাঙ্গ রূপ। যা তাওহীদ, ঈমান, ইবাদত, ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় কার্যক্রম, অপরাধ, সামাজিক আচরণ, উত্তরাধিকার, রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা, এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এতে মানবজীবনের প্রতিটি স্তরের জন্য কিছু বিধিবিধান দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মাধ্যমে পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন অন্য দ্বীন অন্বেষণ করতে। সুতরাং কোন মুমিনের সুযোগ নেই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করার। সুযোগ নেই এ দ্বীনের মধ্যে কিছু সংযোজন, বিয়োজন কিংবা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার। বিধান, কর্তৃত্ব ও রাজত্ব শুধুই আল্লাহর। বরং মুসলমানের ঈমানের আবশ্যকীয় অংশই হলো- সমস্ত শরয়ী বিধিবিধান পালনে সে বাধ্য থাকবে। ব্যক্তি জীবনের জন্য যেমন মনে করা হয় শরয়ী বিধিনিষেধ আছে এবং জীবনের প্রতিটি বাঁকে ব্যক্তির ওপর যেমন কিছু

শরয়ী বিধিনিষেধ রয়েছে, তেমনি সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও "ইসলামী শরী'আত" কিছু দিকনির্দেশনা ও শিক্ষা প্রদান করেছে, যেগুলো মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। রাজনীতি ও শাসন পরিচালনাও সামাজিক জীবনে একটি আবশ্যকীয় ও মৌলিক অংশ। তাই এ ক্ষেত্রেও কোনো মুসলমান স্বাধীন নয়-চাইলে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে কিংবা করবে না, অথবা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছেমতো পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। বরং শরী'আতের এ অঙ্গনেও মুসলমানদের কিছু বিধিবিধান ও দিকনির্দেশনা দিয়েছে, যেগুলো মেনে চলার ব্যাপারে তাকে দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে।

সূরা হাজ্জ, আয়াত নং ৪১ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ الْأُمُور

অর্থঃ "তারা এমন যে, আমি তাদের পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করবে। আর সবকিছুর পরিণাম আল্লাহরই এখতিয়ারে"।

আলোচ্য আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। যাদের শাসনক্ষমতার মূল মাকসাদ ই ছিলো- দ্বীন কায়েম করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন নিজ নিজ যামানায় রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার যে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা এই আয়াতের পূর্ণ বাস্তব রূপ ছিলো। যার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী বিধিবিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। পরিপূর্ণ ইসলামকে বাস্তবে রূপদান ও এক শাশ্বত ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করার এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য কর্মপন্থা, খোলাফায়ে রাশেদীন যার ওপর আমরণ অবিচল ছিলেন। আর যার কারণে তাঁদের রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বিস্তার লাভ করেছিল, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও ছিল এবং মুসলিমরা মাথা উঁচু করে জীবন যাপন করতে পেরেছিলেন। সুতরাং, ইসলামী শাসনব্যবস্থা সেটাকেই বলা হবে-যার মূলভিত্তিই হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা, দ্বীন ইসলাম ও তার বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা। এর প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ীত্বের জন্য

যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয় তাকে ইসলামী রাজনীতি বলা হয়। এর পক্ষান্তরে যে শাসনব্যবস্থার মাকসাদ দ্বীন কায়েম নয়, অথবা কর্মপদ্ধতি কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা বিরোধী হয়, তাহলে সেটা কোনোভাবেই ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও ইসলামী রাজনীতি বলার উপযুক্ত নয়।

আর এটা স্পষ্ট বিষয় যে, মুখে শুধু নাম নেওয়ার দ্বারাই কোনোকিছুর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূলভিত্তি হয়ে যায় না, যতক্ষণ না দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্য বাস্তবায়নের দিক থেকেও সেটাকে মূল লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়। তাই সঠিক ইসলামী শাসনব্যবস্থা সেটাই-যা চিন্তাগত এবং কর্মপন্থায় প্রতিটি ধাপে ইসলামের শিক্ষা বা দিকনির্দেশনার অনুগামী হয়। আর তার কোনো শাখা ইসলামী বিধিবিধানের বিপরীত না হয়।

যেহেতু ইসলাম হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরো মানবজাতির জন্য দিকনির্দেশনা, আল্লাহর নির্ধারিত একমাত্র দ্বীন, চূড়ান্ত দ্বীন সেহেতু মানবজাতির কল্যাণে সারা পৃথিবীজুড়ে নিজস্ব জীবনব্যবস্থা কায়েম করার অধিকার ইসলামের আছে। যাতে পুরো মানবজাতির মধ্যে ন্যায়, ইনসাফ, আদল ও মানবিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং ইসলামী ব্যবস্থার অধীনে ইসলামের শর্ত মেনে বসবাস করতে পারে প্রত্যেকে। ইসলামী জীবনব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার সংরক্ষণ করা।মানবজাতির কল্যাণে এই ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে বলা হয় জিহাদ। জিহাদ হলো প্রস্তুতির নাম, পরিচর্যার নাম, আত্মবিসর্জনের নাম এবং ঈমানের পথে দীর্ঘদিনের পরামর্শ ও পর্যালোচনার নাম। জিহাদ সম্মুখপানে অগ্রসর... ঊর্ধ্বগামী...। আর জিহাদের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো শরী'আতের খেলাফ হুকুম আহকামকে নিজের মাঝে বাস্তবায়িত না করা ও শরী'আতের নাফরমানী না করা।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আস সফ আয়াত নং ৪ এ ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর"।

সূরা মুহাম্মাদ আয়াত নং ৭ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

অর্থঃ"হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তবে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দিবেন"।

সূরা ফাতহ আয়াত নং ১১ এ আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন,

قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًۢا

অর্থঃ বল, 'আল্লাহ যদি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান কিংবা কোন উপকার করতে চান, তবে কে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের জন্য কোন কিছুর মালিক হবে'?

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, আর সৃষ্টি মাত্রই সীমাবদ্ধ। মানুষ মরণশীল, মানুষ অনাদি নয়, শাশ্বতও নয়। তার কিছু সক্ষমতা আছে, আছে সীমাবদ্ধতাও। এই সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করতে পারে না সে। তার উপলব্ধিও তার অস্তিত্বের মতো সীমিত। মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে। মানুষের দায়িত্ব হলো-পৃথিবীতে মহান আল্লাহর খলীফা হওয়া এবং এক আল্লাহর ইবাদাত প্রতিষ্ঠিত করা। এই দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় উপলব্ধি, বুদ্ধিমত্তা ও সক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে।এর বেশিও না, কমও না। ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লড়াই এ ইসলাম মানবীয় বুদ্ধিমত্তাকে নাকচ করে না। চিন্তার সব কাঠামো এবং মাপকাঠি নিতে হবে ইসলাম থেকে। যা কিছু ইসলামের সাথে মিলে না, বাদ দিতে হবে তার সবকিছু।সৃষ্টির মাঝে থাকা নানা নিদর্শনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ বারবার মানুষকে চিন্তা করতে বলেছেন কুরআনে। বুদ্ধির কাজ হলো ওহীকে গ্রহণ করা, এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করা, নিজের সীমার ভেতরে যা আছে, তা অনুধাবন করা। আর যা তার নাগালের বাইরে, তা সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া। বুদ্ধির কাজ এটুকু। কিন্তু বুদ্ধি কখনো চূড়ান্ত বিচারক হতে

পারে না। যেখানে কুরআন সুন্নাহর স্পষ্ট বক্তব্য আছে, সেখানে সোজাসাপ্টা প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করতে হবে। মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ সেখানে নেই। কুরআনের বক্তব্য অবিসংবাদিত। বুদ্ধিমত্তার দায়িত্ব হলো কুরআন থেকে পাওয়া সোজাসাপ্টা অর্থের ভিত্তিতে নিজের পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে নেওয়া। এ কথা বলাবাহুল্য যে, সৌন্দর্য ও সরলতা, স্পষ্টতা ও ভারসাম্য, জীবন ঘনিষ্ঠতা এবং মানবপ্রকৃতির সাথে সঙ্গতি-সব দিক থেকেই ইসলাম মানবজাতির জন্য রহমত।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির নিম্নলিখিত মৌলিক উপাদান ও মূল্যবোধগুলোকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার অক্ষ ধরা যেতে পারে।

১. মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। এখানে পরিবর্তনের সুযোগ নেই। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর চিরস্থায়ী হওয়া, তাঁর একত্ব, সৃষ্টির ওপর তাঁর ক্ষমতা ও রাজত্ব, তাঁর সার্বভৌমত্বসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ এই স্থায়ী বাস্তবতাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ হলেন ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্র।

২. মহাবিশ্ব এবং এর মাঝে থাকা সব বস্তু ও প্রাণী মহান আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন বলেই এ সবকিছু অস্তিত্বে এসেছে। মহান আল্লাহর কোনো শরীক নেই মহাবিশ্বে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো অংশের নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনাতেও।

৩. ইবাদাত শুধু আল্লাহর জন্য। বস্তু, প্রাণী এবং নবী-রাসূলগণসহ সব মানুষ মহান আল্লাহর দাস। মালিক তিনি একাই। মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে সবাই এক এবং সবকিছু তাঁর গোলাম। মহান আল্লাহর সাথে সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক দাসত্বের।

৪. ঈমান ছাড়া যেমন কাজ অর্থহীন, মূল্যহীন, প্রত্যাখ্যাত ঠিক তেমন আমল ছাড়া ঈমান হয়ে পড়ে নিস্তেজ। নেক আমলের শর্ত হলো আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসহ রাসূলগণ, কিয়ামত এবং তাকদীরে বিশ্বাস। কোনো কাজ মহান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবার শর্ত ঈমান।

৫. মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম। ইসলাম ছাড়া অন কোনো বিশ্বাস কিংবা জীবনব্যবস্থা আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। ইসলামের অর্থ এক আল্লাহর ইবাদাত করা, মহান আল্লাহর পবিত্র বৈশিষ্ট্যগুলো কেবল তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করা, সন্তুষ্ট মনে তাঁর হুকুমের সামনে নিজেকে সমর্পণ করা এবং মানবজীবনের সব দিক পরিচালিত করা তাঁর নির্ধারিত শরী'আত অনুযায়ী। পূর্ণ আনুগত্যের শর্তের মধ্যে আছে জীবনের ছোট-বড় সব ক্ষেত্রে সেটা ব্যক্তিগত জীবন হোক বা রাষ্ট্র পরিচালনায় মহান আল্লাহর এবং কেবল তাঁরই নির্দেশ মেনে চলা। এবং রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহ মোতাবেক সামনে অগ্রসর হওয়া।

৬. পৃথিবীর সব প্রাণীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, কারণ তাকে পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পৃথিবী ও এর মাঝে যা কিছু আছে সেগুলো মানুষের অনুগত করা হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যার বস্তুগত মূল মানুষের চেয়ে বেশি। এমন কিছু নেই, যার জন্য মানুষকে বিসর্জন দেওয়া যায়।

৭. সব মানুষ একই উৎস থেকে এসেছে, এ দিক থেকে সব মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে সম্মান ও অবস্থানের পার্থক্য হয় ঈমান, তাকওয়া এবং নেক আমলের ভিত্তিতে। সম্পদ, জাতীয়তা, শ্রেণি, সামাজিক অবস্থান, বর্ণ কিংবা জন্মস্থানের মতো বিষয়গুলোর কারণে কেউ কারও ওপর প্রাধান্য পাবে না।

৮. মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হলো ঈমান এবং আল্লাহর নির্ধারিত পথের অনুসরণ। জাতিগোষ্ঠীগত পরিচয়, বর্ণ পরিচয়, জাতীয়তা, আঞ্চলিক পরিচয়, শ্রেণি পরিচয়, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিংবা অন্য কোনো দুনিয়াবি উদ্দেশ্য-সম্পর্কের ভিত্তি নয়।

৯. দুনিয়ার জীবন হলো পরীক্ষা। এ পরীক্ষা বিশ্বাস ও আমলের। আখিরাতের জীবন হলো হিসাব ও প্রতিদানের। দুনিয়াতে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের হিসেব রাখা হচ্ছে। পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে প্রতিটি কাজ, প্রতিটি উচ্চারণ, ভালো-মন্দ যেকোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রতিটি প্রতিক্রিয়া। আর এ সবকিছুর হিসেব নিয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন মহান আল্লাহ, যিনি সর্বোচ্চ বিচারক।

ইসলামী জীবনব্যবস্থার এই সবগুলো উপাদান ও মূল্যবোধ স্থায়ী। এগুলোতে কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই স্থায়ী উপাদান ও মূল্যবোধগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে ইসলামী সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে, সমাজের সব ধরনের সম্পর্কের মধ্যে, জীবনকে সংগঠিত করার সব প্রচেষ্টায়। এই মূল্যবোধগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে, সব ধরনের পরিবেশে, সব ধরনের প্রেক্ষাপটে। জীবনের সব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন না করা হলো এই স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় সত্যের লঙ্ঘন। ইসলামী মূল্যবোধসমূহ স্থায়ী হওয়ার অর্থ হলো- এটি সমাজ ও শাসনের ক্ষেত্রে এমন কিছু নীতিমালা দেয়, যা শাসক ও জনগণ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শাসক চাইলেই যেকোনো আইন বানিয়ে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। প্রত্যেক মুসলিমের আল্লাহ প্রদত্ত কিছু মৌলিক এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। স্বাধীনতা আছে। এই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার কর্তৃত্ব কোনো শাসক কিংবা বিচারকের নেই। সব মুসলিম শরী'আহ নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য। কোনো শাসকের অধিকার নেই ইসলামের মৌলিক উপাদান এবং মূল্যবোধগুলো বদলানোর।

এ সকল বিষয় এ কথাই দাবি করে যে, উল্লিখিত ইসলামী মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তির উপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সমাজে অপরাধ, দুর্নীতি ও দুরাচার খুব কমই দেখা যাবে। আর সেখানে থাকবে শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং সামাজিক শাসন-শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থাপনা। [ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূলনীতি-সাইয়্যিদ কুতুব (রহঃ)]

খেলাফত ব্যবস্থা: নীতি, উদ্দেশ্য ও ইতিহাস

খেলাফত (ٱلْخِلَافَة) অর্থ প্রতিনিধিত্ব । পারিভাষিক অর্থে ইসলামী খেলাফত হলো, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিচালনার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত পথে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঈমানদার ব্যক্তিদের শাসনব্যবস্থার নাম। এই শাসনব্যবস্থায় আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। খলীফা বা আমীর ও তাঁর পুরো প্রশাসন আল্লাহ প্রেরিত ওহীর বিধানের বাস্তবায়নকারী মাত্র।বস্তুতঃ ইসলামী খেলাফতের সর্বস্তর সর্বাবস্থায় দায়িত্বশীলরা পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, দুনিয়া তাদের ক্ষণস্থায়ী ঠিকানা এবং আখিরাত চিরস্থায়ী জান্নাত। সর্বাবস্থায় আল্লাহভীরুতা হয় খেলাফতের অধীনস্ত নাগরিকদের মূল চালিকাশক্তি। এখানে নেতৃত্ব নিয়ে কোন ঝগড়া নেই। কারণ ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া জায়েজ নেই এবং এটিকে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় আমানতের জওয়াবদিহিতার বিষয় হিসেবে কঠিনভাবে ভয় করা হয়। কেননা কিয়ামতের দিন নেতাকে নিজের দায়ভার ও অধীনস্তদের দায়ভার বহন করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আনআম আয়াত নং ১৬৫ এ ইরশাদ করেছেন,

وَ هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَکُمۡ خَلٰٓئِفَ الۡاَرۡضِ وَ رَفَعَ بَعۡضَکُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَبۡلُوَکُمۡ فِیۡ مَاۤ اٰتٰىکُمۡ ؕ اِنَّ رَبَّکَ سَرِیۡعُ الۡعِقَابِ ۖۡ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ۖۡ

অর্থঃ "আর তিনি সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন (১), যাতে তিনি তোমাদেরকে যা প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। নিশ্চয় তোমার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।

(১) অর্থাৎ, শাসক বানিয়ে কর্তৃত্ব দানে ধন্য করেছেন। অথবা একের পর অন্যকে তার উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) বানিয়েছেন।

সূরা আল আনকাবুত আয়াত নং ১৩ তে আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন,

وَ لَیَحۡمِلُنَّ اَثۡقَالَهُمۡ وَ اَثۡقَالًا مَّعَ اَثۡقَالِهِمۡ ۫ وَ لَیُسۡـَٔلُنَّ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ عَمَّا کَانُوۡا یَفۡتَرُوۡنَ ۧ

অর্থঃ "আর অবশ্যই তারা বহন করবে তাদের বোঝা এবং তাদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা। আর তারা কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে সে সম্পর্কে, যা তারা মিথ্যা বানাতো"।

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা একারণে, যাতে মানুষ পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে ইসলামী বিধান সমূহ যথাযথভাবে পালন করতে পারে এবং মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ আল্লাহর গোলামীর অধীনে পূর্ণ মানবাধিকার ভোগ করতে পারে। সে কারণে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা মুমিনের ঈমানী দাবী। খেলাফত ব্যতীত বাকী সকল ব্যবস্থাই মানুষের ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠার বাহন ব্যতীত কিছু নয়। অতএব এই তাক্বওয়াভিত্তিক ইসলামী খেলাফত হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কল্যাণময় রাষ্ট্রব্যবস্থা। ইসলামকে যেমন কোন একটি দল বা সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট বলে গণ্য করা যায় না, ইসলামী খেলাফতকেও তেমনি নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের জন্য গণ্য করা যায় না। বরং এটি দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর। যেমন আল্লাহর দেওয়া আলো-বাতাস, মাটি ও পানি সবার জন্য সমভাবে কল্যাণকর।

চারজন বিশিষ্ট সাহাবী যথাক্রমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত উমর ফারুক (রাঃ), হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এবং হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ), রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের পর মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব প্রদান করেন। এর বাইরে ইসলামী ইতিহাসে উমাইয়া, আব্বাসীয় ও উসমানীয় খেলাফতে আরও অনেক খলীফা ছিলেন, যার মধ্যে অনেকে উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ)-কে ইসলামের পঞ্চম খলীফা বলে খোলাফায়ে রাশেদার মধ্যে গণ্য করেন। কারণ খোদাভীতি, বিচক্ষণতা, সাহসিকতাসহ সাহাবাদের অনন্য গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ) এর মাঝে। তাঁর শাসনকাল ছিল মাত্র দুইবছর পাঁচ মাস।

ইসলামে খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকালঃ

খলীফা	খেলাফতকাল
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)	২ বছর ৩ মাস (রবিউল আউয়াল ১১ হিজরি- জুমাদাল উখরা ১৩ হিজরি, জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ -আগস্ট ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)
হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)	১০ বছর (জুমাদাল উখরা ১৩ হিজরি- জিলহজ্জ ২৩ হিজরি, আগষ্ট ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ-নভেম্বর ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)	১২ দিন কম ১২ বছর জিলহজ্জ (২৩ হিজরি-জিলহজ্জ ৩৫ হিজরি, নভেম্বর ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ-জুন ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)
হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)	৫ বছর (জিলহজ্জ ৩৫ হিজরি-রমজান ৪০ হিজরি, জুন ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ-জানুয়ারি ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ)

ইসলামের প্রথম খলীফা হিসেবে আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) এর নির্বাচনঃ
রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামের অনেকে শোক ও ভালোবাসার আতিশয্যে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, নবীজির ইন্তেকাল হয়েছে। কেউ বলছিলেন, নবীজি ইন্তেকাল করেছেন; কেউ বলছিলেন, নবীজি মারা যাননি। সংবাদ পেয়ে হযরত আবূ বকর (রাযি.) নবীজির হুজরায় উপস্থিত হন এবং কাপড় সরিয়ে নবীজির চেহারা মোবারকে চুম্বন করেন। নবীজির ইন্তেকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন- হামদ ও সালাতের পর, কেউ যদি মুহাম্মাদের উপাসনা করে থাকে, তাহলে তার জন্য সংবাদ হলো-মুহাম্মাদ ইন্তেকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করে, তাদের মনে রাখতে হবে-আল্লাহ চিরঞ্জীব, তার মৃত্যু নেই। আল্লাহ তা'আলা তো ইরশাদ করেছেন-

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوۡلٌ ۚ قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَائِنۡ مَّاتَ اَوۡ قُتِلَ انْقَلَبۡتُمۡ عَلٰۤی اَعۡقَابِكُمۡ ؕ وَ مَنۡ يَّنۡقَلِبۡ عَلٰی عَقِبَيۡهِ فَلَنۡ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيۡئًا ؕ وَ سَيَجۡزِی اللّٰهُ الشّٰكِرِيۡنَ

অর্থঃ "আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দিবেন"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৪৪]

উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত উমর (রাযিঃ) ও ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) এর মুখে এ আয়াত শুনে সকলের মনে হচ্ছিলো, আয়াতটি বুঝি আজই তারা প্রথম শুনছেন। আবূ বকর (রাযিঃ) এর কথায় সকলের মন শান্ত-প্রশান্ত হয় এবং

দ্বিধা-সংশয় দূর হয়ে যায়। এরপর সকলে বনু সাইদার ছায়া-ছাউনিতে সমবেত হয় এবং নবীজির অবর্তমানে কে -মুসলমানদের নেতৃত্ব দিবেন, এ বিষয়ে পরামর্শ করে। মতবিনিময়ের পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ই হবেন নবীজির খলীফা। সকলে এ সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করে।[ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ (১ম খন্ড) মাকতাবাতুল হাসান প্রকাশনী]

যখন তিনি খেলাফতের দায়িত্ব নিলেন, তখন খুতবা প্রদান করলেন খুতবার শুরুতে হামদও সানার পর তিনি বললেন:

أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسَأْتُ فَقَوموني الصدق أمانة والكذب جبالة ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

٢/ ٢٣٤ : سيرة ابن هشام : ٤/٢٤٠، عيون الأخبار لابن قتيبة.

অর্থঃ "হে লোক সকল! আমাকে তোমাদের যিম্মাদারী অর্পণ করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। যদি আমি ভাল কাজ করি তাহলে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। আর যদি আমি কোনো ভুল করি, তাহলে তোমরা আমাকে সংশোধন করে দিবে। সত্য বলা আমানত, মিথ্যা বলা খেয়ানত। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তিও আমার নিকট শক্তিশালী বলে বিবেচিত হবে যতক্ষণ না আমি তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দেই, আর তোমাদের দাপটী ব্যক্তিও আমার নিকট দুর্বল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না আমি তার থেকে অন্যের প্রাপ্য উদ্ধার করে নেই ইন শা আল্লাহ। কোনো কওম যখন আল্লাহর রাহের জিহাদ পরিত্যাগ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেন। আর কোনো কওমের মধ্যে যখন অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ব্যাপকভাবে বিপদে আক্রান্ত করেন। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার আনুগত্য করবে, আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, তাহলে আমার আনুগত্য তোমাদের দায়িত্ব নয়। নামাযের জন্য দাঁড়াও, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর রহম করুন।' (সীরাতে ইবনে হিশাম:৪/২৪০, উয়ূনুল আখবার: ২/২৩৪)।

খোলাফায়ে রাশেদীনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধান অর্থাৎ খলীফা নির্বাচনের কয়েকটি পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যথা-

১.পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক পরবর্তী খলীফার মনোনয়ন । যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) তার পরবর্তী খলীফা হিসেবে হযরত উমর (রাঃ) কে মনোনীত করে যান বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, আবদুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ), হযরত উসমান গণী (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) সহ বিভিন্ন সাহাবীগণ। এভাবে পরামর্শ অনুসারে তিনি একটি ওসীয়তনামা লেখার নির্দেশ দিলেন যে ওসীয়তের বিষয়বস্তু ছিল এরুপঃ

"এটা হচ্ছে সেই চুক্তি, যা খলীফাতুর রাসূল (ﷺ) হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর ইহলৌকিক জীবনের শেষ সময় এবং পারলৌকিক জীবনের প্রথম সময় করেছেন। এরূপ অবস্থায় কাফির ব্যক্তিও ঈমান আনয়ন করে এবং কাফির (পাপী) ব্যক্তিও বিশ্বাস স্থাপন করে। আমি তোমাদের উপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবকে নিযুক্ত করেছি এবং আমি তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণ করতে ত্রুটি করিনি। অতএব উমর (রাঃ) যদি সুবিচার ও সবর দ্বারা পরিচালিত হয় তবে তা হবে তাঁর সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার ফল। আর যদি সে অন্যায় ও অবিচার করে, তবে আমি গায়েব সম্বন্ধে অবহিত নই। আমি তো মঙ্গল ও কল্যাণই কামনা করেছি। আর প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কর্মফল ভোগ করে থাকে। [ইসলামের ইতিহাস (১ম খন্ড)- মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী (রহঃ), ইসলামের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ(১ম খন্ড), ইবনে সা'দ, আত্ব-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ৩/১৯৯ পৃ.)]

২.খলীফা তার পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য বিশেষ জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করার মাধ্যমে । যেমন: হযরত উমর (রাঃ) তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি শূরা বোর্ড গঠন করে দিয়ে যান।[ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১৩/১৯৩ পৃ] ঐ ছয় ব্যক্তি হলেনঃ হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ), হযরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)। শূরা বোর্ড গঠন করে হযরত উমর (রাঃ) বললেন, 'আমার মৃত্যুর পর তিন দিনের ভেতর তোমরা পরস্পরে পরামর্শ করে

নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে আমীর নিযুক্ত করে নিবে। [ইসলামের ইতিহাস (১ম খন্ড)-মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী (রহঃ), তাফসীর ইবনে কাসীর]
নিজ ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ)-কে সেই শূরায় শুধু এই শর্তে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন যে, তিনি শুধু পরামর্শ দিতে পারবেন; কিন্তু খেলাফতের জন্যে তার নাম প্রস্তাব করা যাবে না। এভাবে তারা সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রাঃ)-কে খলীফা মনোনীত করেন। উমর (রাযি.) বললেন- আমার পরবর্তী খলীফাকে আমি অসিয়ত করছি, তিনি যেন প্রবীণ মুহাজিরদের হক সম্পর্কে সচেতন থাকেন এবং তাদের মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। আমি তাকে আনসারি সাহাবীগণের প্রতিও সদ্ব্যবহারের অসিয়ত করছি; যারা পূর্ব থেকেই এ নগরীতে বসবাস করছেন এবং মুহাজিরদের পূর্বে ঈমান এনেছেন। তাদের কল্যাণকর্ম যেন গ্রহণ করা হয় এবং তাদের ত্রুটি যেন মার্জনা করা হয়।আমি তাকে আরও অসিয়ত করছি, তিনি যেন বিভিন্ন নগরীর অধিবাসীদের সঙ্গে কোমল আচরণ করেন। কারণ, তারাই ইসলামের হেফাজতকারী, অর্থের জোগানদাতা ও শত্রুর চোখের কাঁটা (আধিক্য ও প্রভাবের মাধ্যমে তারা শত্রুদেরকে ক্রোধান্বিত করে)। তাদের কাছ থেকে যেন কেবল তাদের সন্তুষ্টচিত্তে সম্পদের অতিরিক্ত অংশের যাকাত গ্রহণ করা হয়।আমি তাকে আরও অসিয়ত করছি, তিনি যেন বেদুইনদের সঙ্গেও সদাচরণ করেন। কারণ, তারাই আরবজাতির ভিত্তি ও ইসলামের মূল শক্তি। তাদের সম্পদের অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করে যেন তাদের দরিদ্রদের মাঝেই ফেরত দেওয়া হয়। আমি তাকে আরও অসিয়ত করছি, জিম্মিদের সঙ্গে আল্লাহ ও তার রাসূলের কৃত অঙ্গীকার যেন পূরণ করা হয়, (তারা শত্রু-কর্তৃক আক্রান্ত হলে) যেন তাদের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ করা হয় এবং তাদের ওপর যেন সাধ্যাতীত জিজিয়া আরোপ করা না হয়।[ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ (১ম খন্ড) মাকতাবাতুল হাসান প্রকাশনী]

৩। খলীফা তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের বিষয়টি জনসাধারণের উপর ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে। যেমন: হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি পরবর্তীদের উপর ছেড়ে দিয়ে যান। হযরত উসমান (রাযি.) নিহত হওয়ার পর মদিনা খেলাফতশূন্য হয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের মিশরীয় নেতা গাফিকি বিন হারব-ই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিল। মদিনাবাসী এ সময় কার্যত অসহায় হয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহীরা যদিও খলীফা উসমান (রাযি.)-কে হত্যার প্রশ্নে একজোট ছিল; কিন্তু নতুন

খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে তারা মতবিভক্ত ছিল। মিশরীয় বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিল হযরত আলী (রাযি.)-এর প্রতি, বসরার বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিল তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাযি.)-এর প্রতি আর কুফার বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিল যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর প্রতি। কিন্তু তারা তিনজনই বিদ্রোহীদের প্রত্যাখ্যান করায় বিদ্রোহীরা এরপর সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) কে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি আরও কঠোর ভাষায় বিদ্রোহীদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খলীফার সহায়তায় আগত বাহিনীগুলো মদিনার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে বিদ্রোহীরা মদিনাবাসীকে হুমকি প্রদান করে এবং দুদিন সময় দিয়ে বলে যে, এরমধ্যে মদিনাবাসী নতুন খলীফা নির্বাচিত করতে না পারলে তারা আলী ও যুবায়ের (রাযি.)-সহ অনেককে হত্যা করবে।এরপর মদিনায় উপস্থিত বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম সর্বদিক বিবেচনা করে হযরত আলী (রাযি.)-কেই সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করে তাকে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। আলী (রাযি.) তা প্রত্যাখ্যান করলেও সকলে তাকে উম্মাহর এই চরম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকে। অবশেষে ২৫ জিলহজ্জ সকলে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে।[ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ (১ম খন্ড) মাকতাবাতুল হাসান প্রকাশনী]

সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক কে?

কুরআনুল কারীমের সূরা আল বাকারা, আয়াত নং-১০৭ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

اَلَمۡ تَعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ وَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِیٍّ وَّ لَا نَصِیۡرٍ

অর্থঃ "আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবকও নেই, নেই সাহায্যকারীও"।

تَبٰرَكَ الَّذِیۡ بِیَدِهِ الۡمُلۡكُ ۫ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرُ ۙ﴿۱﴾

অর্থঃ "অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর হাতে ; তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান"।(সূরা মুলক আয়াত নং-১)

সুতরাং সার্বভৌমত্ব/ শাসনক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর, মানুষের নয়। তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্তা, মালিক। মানুষ হলো তাঁর দাস।

গণতন্ত্রের সঙ্গা থেকে জানা যায় যে,
গণতন্ত্র মূলত মানুষের শাসনের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে যার সার্বভৌমত্ব জনগণের হাতে।
ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং শরী'আতই সর্বোচ্চ আইন। এ ব্যবস্থার বৈধতা আসে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর শরী'আত প্রতিষ্ঠার দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে।

পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে দলীলঃ

الآلة الخلق والأمر

অর্থঃ "নিশ্চয় সৃষ্টি যার, বিধান দেওয়ার অধিকার তাঁরই।"(সূরা আরাফ- ৫৪)

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ

অর্থঃ "নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ যা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী তুমি মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়াসালা করো। (সূরা নিসা: ১০৫)

আর যারা তাঁর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার ও শাসন চালায় না, তাদেরকে তিনি শ্রেণীভেদে কাফির, জালিম ও ফাসিক নামে অভিহিত করেছেন:

সূরা মায়েদার যথাক্রমে ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون َ

অর্থঃ “যারা আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে না, তারা কাফির”।

وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ َ

অর্থঃ “যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারা জালিম”

وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ َ

অর্থঃ “যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারাই ফাসিক”।

এই আয়াতগুলো থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী শাসন করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু, গণতন্ত্রে আইন প্রণয়ন হয় জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে, চাই তা কুরআন হাদিসে বর্ণিত বিধান হোক বা কুরআন হাদিসে বর্ণিত বিধান না হোক।

সূরা আল ইমরান আয়াত নং ২৬ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الۡمُلۡكِ تُؤۡتِي الۡمُلۡكَ مَنۡ تَشَآءُ وَ تَنۡزِعُ الۡمُلۡكَ مِمَّنۡ تَشَآءُ ۫ وَ تُعِزُّ مَنۡ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنۡ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الۡخَيۡرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ۖ

অর্থঃ "বলুন, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা আপনি ইজ্জত দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। কল্যাণ আপনার হাতেই। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান"।

সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২৮৪ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَ اِنۡ تُبۡدُوۡا مَا فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ اَوۡ تُخۡفُوۡهُ يُحَاسِبۡكُمۡ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغۡفِرُ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ە

অর্থঃ "যা কিছু আকাশসমূহে ও ভূমন্ডলে আছে, সবকিছু আল্লাহরই। তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ করো কিংবা গোপন করো আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন। সুতরাং যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান"।

সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ১৮৯ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَ لِلّٰهِ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ە:

অর্থঃ "আর আসমান ও যমীনের সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র আল্লাহরই; আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান"।

সূরা হূদ আয়াত নং ৪ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

اِلَى اللّٰهِ مَرۡجِعُكُمۡ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ە

অর্থঃ "আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আর রাদ আয়াত নং ৪১ এ ইরশাদ করেছেন,

وَ اللّٰهُ يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهٖ ؕ وَ هُوَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ

অর্থঃ "আর আল্লাহই হুকুম করেন এবং তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই এবং তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী"।

সূরা আল আম্বিয়া আয়াত নং ২৩ এ তিনি ইরশাদ করেছেন,

لَا يُسۡـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَ هُمۡ يُسۡـَٔلُوۡنَ

অর্থঃ "তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে"।

সূরা আল মায়িদা আয়াত নং ১ এ আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيۡدُ

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন"।

সূরা আল মুমিনূন আয়াত নং ৮৮ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

قُلۡ مَنۡۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوۡتُ كُلِّ شَىۡءٍ وَّ هُوَ يُجِيۡرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيۡهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

অর্থঃ বল, 'তিনি কে যার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর ওপর কোন আশ্রয়দাতা নেই?' যদি তোমরা জানো।

সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বনাম কুরআন সুন্নাহের ফয়সালা

গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের সকলে একমত হওয়ার দরকার নেই। বরং অধিকাংশ সদস্য একমত হওয়ার মাধ্যমে এমন সব আইন জারী করা যায় জনগণ যেসব আইন মেনে চলতে বাধ্য; এমনকি সে আইন যদি মানব প্রকৃতি, ধর্ম, বিবেক ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবুও। বরং এই তন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরকে প্রতিহত করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে জানিয়েছেন, হুকুম বা শাসনের মালিক একমাত্র তিনি এবং তিনিই হচ্ছেন- উত্তম হুকুমদাতা বা শাসক।

কুরআনুল কারীমের সূরা আনআম আয়াত নং ১১৬ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَ اِنۡ تُطِعۡ اَكۡثَرَ مَنۡ فِى الۡاَرۡضِ يُضِلُّوۡكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ اِنۡ يَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنۡ هُمۡ اِلَّا يَخۡرُصُوۡنَ ﴿۱۱۶﴾

অর্থঃ "যদি আপনি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে ; আর তারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে"।

এ আয়াতের মাধ্যমে কুরআন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যদি আপনি সংখ্যাধিক্যতার অনুসরণ করেন তাহলে তার আপনাকে গোমরাহ করে ফেলবে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা অনেক বার বলেছেন,

"কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না"।

وَ لٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ

[সূরা আল বাকারা-১৩], [সূরা আনআম - ৩৭], [সূরা ইউনুস-৫৫], [সূরা আন আনফাল-৩৪] [সূরা ইউসুফ - ২১, ৪০, ৬৮], [সূরা নাহল - ৩৮], [সূরা আম্বিয়া -

২৪], [সূরা লোকমান-২৫], [সূরা সাবা - ২৮, ৩৬]- [সূরা আরাফ-১৮৭], [সূরা রুম -৬, ৩০], [সূরা মুমিন-৫৭], [আল জাসিয়াহ -২৬] এই ধরনের আয়াতে 'অধিকাংশ' (أكثر) শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে যে, অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ সঠিক-বেঠিকের মানদণ্ড নয়।

ইসলামে অধিকাংশ মানুষের মত কোনো বিষয়ে হক বা সত্যের মানদণ্ড নয়, কিন্তু গণতন্ত্রে অধিকাংশের মত-ই হক বা সত্যের মানদণ্ড। ইসলামে বেশিরভাগ মানুষের রায় কখনোই অকাট্য ও চূড়ান্ত দলিল নয়, কিন্তু গণতন্ত্রে এটিই অকাট্য ও চূড়ান্ত দলিল। ইসলামে অধিকাংশের রায়কে হক-বাতিল ও সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি ধরা হয় না, কিন্তু গণতন্ত্রে একেই হক-বাতিল ও সত্য-মিথ্যার মূল মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়।

সূরা ইউসুফ আয়াত নং ২১ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَ اللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمۡرِهٖ وَ لٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ

অর্থঃ "আল্লাহ তাঁর কাজের ক্ষেত্রে অপ্রতিহত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা"।

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর নির্বাচনও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে হয়নি। আল্লামা আকবার শাহ খান নজিবাবাদি (রহঃ) এর লেখা ইসলামের ইতিহাস- ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত ১ম খন্ড এবং তারীখে ইসলামে (২১৭\১) লেখা রয়েছে যে,

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد سقیفہ بن ساعدہ میں ہوا، سقیفہ بن ساعد وانصار کا محلہ تھا، وہاں اکثریت انصار کی تھی، کوئی دو مہاجر بھی اتفاقا وہاں موجود تھے۔

"হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু সাকীফা বনূ সাইদায় খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন, যেটি ছিল আনসারদের এলাকা। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আনসার ছিলেন, কেবল দু'একজন মুহাজির সেখানে কাকতালীয়ভাবে হাজির ছিলেন"।

হযরত বাশীর ইবন নুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে الائمة مِنْ قُرَيش "নেতা হবে কুরাইশ থেকে" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর এই হাদিসটি উপস্থাপন করেন। তাই ফয়সালা গ্রহণ করা হয়েছে শক্তিশালী প্রমাণের ভিত্তি।

সাকীফা বনূ সাইদার ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইসলামে "সংখ্যাগরিষ্ঠতার চেয়ে সত্য এবং সুন্নাহর দলিলের গুরুত্ব বেশি।যদি ফয়সালা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হতো, তবে ফয়সালা হতো সা'দ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে, তিনি খলীফা হতেন। কারণ সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আনসার সাহাবী ছিলেন, যারা সা'দ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে ছিলেন। কিন্তু দলিলের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হলেন মুহাজিরদের মধ্যে থেকে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি আবূ বকর সিদ্দীক(রাঃ)।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শূরার বাস্তব প্রয়োগ

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে 'শূরা' বা পরামর্শভিত্তিক শাসনব্যবস্থার অত্যন্ত শক্তিশালী ও বাস্তব প্রয়োগ ছিল। এটি কেবল পরামর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনগত ও প্রশাসনিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করতো। খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে চারজন খলীফাকে বোঝানো হয়।হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) ও হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)। তাদেরকে রাশেদীন তথা সুপথগামী বলার কারণ হলো তারা সত্যকে চিনতে পেরেছেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করেছেন। যে ব্যক্তি সত্যকে চিনতে পেরেছে এবং অনুসরণ করেছে, সেই রাশেদ বা সুপথপ্রাপ্ত। উনারা ছিলেন আশরায়ে মুবাশশারা অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি।

খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শূরার বাস্তব প্রয়োগ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। যেমনঃ শাসনভার গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ খলীফা নির্বাচন করা। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফত গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের মতামত তাঁর পক্ষে স্থির হয় (আল-ইবানাহ আন উসূলিদ দিয়ানাহ, পৃ. ৬৬)। এ প্রক্রিয়া দু'টি বাই'আতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল- প্রথমটি ছিল সাক্বীফায় উপস্থিত বিশিষ্ট আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের বিশেষ বাই'আত, দ্বিতীয়টি ছিল মসজিদে সাধারণ মানুষের সমাবেশে সর্বসাধারণের বাই'আত (সহীহ বুখারী, ৯/১০০ পৃ.)।

হযরত আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন নিজের ইন্তেকাল ঘনিয়ে আসা অনুভব করলেন, তখন তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে এবং মুসলিম জনমতের সমর্থন দেখে হযরত উমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসাবে মনোনীত করেন। এরপর তিনি হযরত উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সেই অঙ্গীকারনামা লিখে দিতে নির্দেশ দেন (ইবনে সা'দ, আত্ব-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ৩/১৯৯ পৃ.)। উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতও দুই পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছিল- প্রথমতঃ উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মনোনীত ছয়জনের মধ্য থেকে তাঁকে নির্বাচন করা হয়, দ্বিতীয়তঃ মদীনাবাসী সাহাবীদের সঙ্গে ব্যাপক পরামর্শের পর জনগণের

বাই'আতের মাধ্যমে তিনি খলীফা হন (ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১৩/১৯৩ পৃ.)। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষেত্রেও অধিকাংশ মুসলিম তাঁর হাতে বাই'আত করেন। অল্প কিছু লোক হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকারীদের কিসাসের বিষয়ে মতভেদের কারণে বিরোধিতা করলেও তাঁর খেলাফতের বৈধতা নিয়ে তাদের আপত্তি ছিল না (আবূ দাঊদ, ৫/৩৬ পৃ.)। তাঁর প্রথম বক্তব্য ছিল, 'আমি সঠিক কাজ করলে আমাকে সাহায্য করবে, আর ভুল করলে আমাকে সংশোধন করবে' (তাখরীজু মুসনাদে আবী বকর, ১/১৫৯; ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, ৪/৬৬; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫/২৮০ পৃ.)। এরপর হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছেও তাঁর পিতার অনুগত আমীর ও সাধারণ মানুষ বাই'আত নেন। পরে তিনি ৪১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে শাসনভার অর্পণ করেন।

এভাবে দেখা যায় যে, শূরার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরই ছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বৈশিষ্ট্য। খোলাফায়ে রাশেদীন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কুরআন ও সুন্নাহতে সরাসরি নির্দেশ না থাকা রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে শূরার উপর নির্ভর করতেন আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুসরণ করে, 'আর তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়' (সূরা আশ-শূরা : ৩৮)। এই নীতিতে তারা পরবর্তী বহু শতাব্দীর যুগের চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন। সেই কারণে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জনগণকে পরামর্শ ও সমালোচনার আহ্বান জানিয়েছিলেন (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ই'তিসাম, باب وأمرهم شورى بينهم, ৯/১১৩ পৃ.)। তিনি এমন বিষয়ে, যার ব্যাপারে কুরআন বা সুন্নাহতে স্পষ্ট নির্দেশ নেই, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও আলিমদের একত্র করতেন এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন (ইবনু রজব, ফাতহুল বারী, ১৩/৩৪২ পৃ.)। হযরত উমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও রাষ্ট্রের সব বিষয়ে একই নীতি অনুসরণ করতেন। তিনি গভর্নর ও সামরিক নেতাদের নির্দেশ দিতেন যেন তারা সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি আবূ উবাইদা সাক্বাফীকে বলেছিলেন, 'নবী (ﷺ)-এর সাহাবীদের কথা শুনবে, তাদেরকে পরামর্শে শরীক করবে এবং বিষয় পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিবে না' (তারীখুল উমাম, তাবারী, ২/৩৬১ পৃ.)। এমনকি তিনি নারীদের সঙ্গেও পরামর্শ করতেন, এটিও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত (বাইহাক্বী, আস-সুনান, ১০/১১৩ পৃ.; আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৭/১৫২ পৃ.)।

হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দেখা যায়। তিনি কুরআনের একক মুসহাফ সংকলনের বিষয়ে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'হে লোকসকল! তোমরা উসমান সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করো না এবং কুরআনের কপিসমূহ সংকলন ও পোড়ানোর ব্যাপারে তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছু বলো না। আল্লাহর কসম! তিনি যা করেছেন, তা আমাদের সবার পরামর্শেই করেছেন' (আবূ দাঊদ, কিতাবুল মাসাহিফ, পৃ. ৯৭)। এমনকি কঠিন অবরোধের সময়ও তিনি পরামর্শ ত্যাগ করেননি। যখন অবরোধ তীব্র হয়, তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে ডেকে তাঁদের দাবির বিষয়ে মতামত চান। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তোমাকে যে খেলাফতের পোশাক পড়িয়েছেন, তা তুমি তাদের চাপে খুলে ফেলো না' (ইবনু শাব্বাহ, তারীখুল মাদীনাহ, ৪/১২২৬ পৃ.)। তিনি এ পরামর্শ মেনে শেষ পর্যন্ত ধৈর্যসহকারে শাহাদাত বরণ করেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও পূর্বসূরীদের নীতি অনুসরণ করেন। তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ করতেন। এমনকি তিনি যুবাইর ও তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে তাঁর কাছে রাখতেন এবং বলতেন, 'তোমরা আমার কাছে থাকবে, যাতে আমি তোমাদের সান্নিধ্যে স্বস্তি পাই' (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/২০৭)

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন করার পদ্ধতি কখনোই সারা দেশে ইলেকশনের মাধ্যমে হয়নি। এমনকি সকল সাহাবায়ে কেরামও (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শরিক ছিলেন না। এমনিভাবে, পুরো মদিনাবাসীও অংশগ্রহণ করেন নি। বরং কিছু শূরা সদস্যরা নির্বাচন করার পর সকলে বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছেন। উনারা যেই শূরা সদস্যদের সাথে পরামর্শ করতেন তারা সকলেই ছিলেন মুমিন, মুত্তাকি, জ্ঞানী, বিশ্বস্ত যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট। যাদের মাঝে অনেকে ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার ১০০ নং আয়াতে মুহাজিরীন এবং আনসার ও যারা আল্লাহ ভীতির সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের পরিচয় দিয়ে তাদের উপর রাজি খুশি হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন,

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

অর্থঃ"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। সেটি মহাসাফল্য"।

সুতরাং তাদের পরে এমন কারা আছে যারা ইসলামকে এবং ইসলামের চাহিদাকে অধিক বুঝতে পারবে??

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ، - يَعْنِي ابْنَ زَبْرٍ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ، قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ فَقَالَ " عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلاَفًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ" .

অনুবাদঃ 'আব্দুল্লাহ্ ইবন আহমদ ইবন বাশীর ইবন যাকওয়ান দিমাকী (রহঃ)... ইয়াহইয়া ইবন আবু মুতা' (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি ইরবায ইবন সারিয়া (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছি,একদিন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আমাদের নসীহত করলেন। এতে আমাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হলো এবং চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এলো। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আপনি আমাদের বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তির ন্যায় নসীহত করলেন, সুতরাং এ ব্যাপারে আপনি আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিন। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে আর শুনবে ও অনুসরণ করবে, যদিও তোমাদের নেতা হাবশী গোলাম হয়। আমার পরে অচিরেই তোমরা কঠিন মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের উপর আমার সুন্নত এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের উপর অবিচল থাকা অপরিহার্য। তোমরা তা শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে। সাবধান! তোমরা নতুন উদ্ভাবিত জিনিস (বিদ'আত) পরিহার করবে। কেননা প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী।[সুনান ইবনে মাজাহ,হা/৪২]

শরীঈ শূরা ও সংসদীয় পদ্ধতির পরামর্শনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ

শরীঈ শূরাঃ

শূরা (আরবি: الشورى) শব্দের অর্থ হলো পরামর্শ, উপদেশ দেওয়া, পরামর্শসভা বা মতবিনিময়। ইসলামের পরিভাষায়, শরী'আতের নির্দেশনার আলোকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যোগ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করাকে 'শূরা' বা 'শরীঈ শূরা' বলা হয়।

পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা সূরা আশ শূরা নাযিল করেছেন। এ সূরাতে পরামর্শ করে কাজ করা মু'মিনদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আশ শূরা এর ৩৮ নম্বর আয়াতে শূরা শব্দটি উল্লেখ আছে এবং মক্কায় নাযিলকৃত সূরাসমূহের মধ্যে একটি। মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে মক্কায় সেই অবস্থার মধ্যেও মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্মীয় যাবতীয় ব্যাপারাদি সুসম্পন্ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পারস্পরিক পরামর্শের নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন। সূরা আশ-শূরা আয়াত নং ৩৮ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪
وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۪
و الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شورى بينهم و مما رزقنهم ينفقون

অর্থঃ "আর যারা তাদের রবের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, তাদের কার্যাবলী তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।"

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ইমরান আয়াত নং ১৫৯ এ আরো ইরশাদ করেছেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

অর্থঃ “অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে আপনি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলেন। আর যদি আপনি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়তো। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ করুন (১)। অতঃপর যখন সংকল্প করবেন তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন (২) । নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন”।

তাফসীর গ্রন্থ তাফসীর ইবনে কাছির ও তাফসীর শাস্ত্র ফাতহুল কাদীর থেকে সূরা আল ইমরান আয়াত নং ১৫৯ এর পরামর্শ সংক্রান্ত আলোচনাঃ

(১) অর্থাৎ, মুসলিমদের মনস্তুষ্টির জন্য পরামর্শ করে নিবেন। এই আয়াত দ্বারা পরামর্শ করার গুরুত্ব, তার উপকারিতা এবং তার প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা প্রমাণিত হয়। পরামর্শ করার এই নির্দেশ কারো নিকট ওয়াজিব এবং কারো নিকট মুস্তাহাব। (ইবনে কাসীর) ইমাম শওকানী লিখেছেন যে, 'শাসকদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, তাঁরা এমন সব ব্যাপারে উলামাদের সাথে পরামর্শ করবেন, যে সব ব্যাপারে তাঁদের জ্ঞান নেই অথবা যে ব্যাপারে তাঁরা সমস্যায় পড়েন। সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন অফিসারদের সাথে সৈন্য সংক্রান্ত বিষয়ে, জনগণের দায়িত্বে নিয়োজিত নেতাদের সাথে জনসাধারণের কল্যাণ প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত সরকারী দায়িত্বশীলদের সাথে সেই অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরামর্শ করবেন। ইবনে আত্বিয়্যাহ বলেন, এমন শাসকদের বরখাস্ত করার ব্যাপারে কোনই দ্বিমত নেই, যাঁরা আলেম ও দ্বীনদারদের সাথে কোন পরামর্শ করেন না। আর এই পরামর্শ সেই সব বিষয়ের মধ্যেই সীমিত থাকবে, যে সব ব্যাপারে শরী’আত নীরব (যে সম্বন্ধে শরী’আতের সুস্পষ্ট কোন সমাধান নেই) অথবা যার সম্পর্ক হলো প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সাথে। (ফাতহুল ক্বাদীর)

(২) পরামর্শ করার পর যে মতের উপর তোমার সংকল্প সৃষ্টি হবে, আল্লাহর উপর ভরসা করে তা কার্যকরী করবে। এ থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, পরামর্শ করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ হবে শাসকের, পরামর্শদাতাদের অথবা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেদের হবে না, যেমন সাধারণ গণতন্ত্র রাষ্টে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ

সম্পূর্ণ ভরসা ও নির্ভর করতে হবে মহান আল্লাহর উপরে, পরামর্শদাতাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপরে নয়। পরের আয়াতেও আল্লাহর উপর ভরসা করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে।

শরঈ শূরা ও প্রচলিত গণতান্ত্রিক সংসদীয় পরামর্শ পদ্ধতি অভিন্ন কিনা?

শরঈ শূরা (পরামর্শ পদ্ধতি) ও প্রচলিত গণতান্ত্রিক সংসদীয় পরামর্শ এক নয় বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সম্পর্কে হাকীমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ আশরাফুল জওয়াব: ২৭৫ এ লিখেছেন-

بعض لوگ ایسے بے وقوف ہیں کہ وہ جمہوری حکومت کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے دراصل جمہوریت ہی کی تعلیم دی ہے، اور دلیل کے طور پر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۱۵۹ پیش کرتے ہیں

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے مشورہ کے اصلی حکم ہی کو مسخ کر دیا ہے اور اسلام میں شوریٰ یا مشورہ کا جو مرتبہ و مقام ہے، اس کو بالکل سمجھنے سے قاصر رہے ہیں"۔

অনুবাদঃ “”কিছু লোক এতটাই নির্বোধ যে, তারা গণতান্ত্রিক শাসনকে জোরপূর্বক ইসলামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চায়। তারা দাবি করে যে, ইসলাম আসলে গণতন্ত্রেরই শিক্ষা দিয়েছে, এবং প্রমাণ হিসেবে সূরা আল ইমরান আয়াত নং ১৫৯ পেশ করে-

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ

অর্থঃ “সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো”

কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল। এরা পরামর্শের প্রকৃত বিধানকেই বিকৃত করে দিয়েছে এবং ইসলামে শূরা বা পরামর্শের যে মর্যাদা ও অবস্থান রয়েছে, সেটিকে বিলকুল বুঝতে সক্ষম হয়নি""।

সূরা কাহাফ আয়াত নং ৫৪ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَ لَقَدۡ صَرَّفۡنَا فِیۡ هٰذَا الۡقُرۡاٰنِ لِلنَّاسِ مِنۡ کُلِّ مَثَلٍ ؕ وَ کَانَ الۡاِنۡسَانُ اَکۡثَرَ شَیۡءٍ جَدَلًا

অর্থঃ "আর আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সকল প্রকার উপমা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আর মানুষ সবচেয়ে বেশি তর্ককারী"।

অর্থাৎ, এই আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মানুষদেরকে সত্য পথ বুঝানোর জন্য কুরআনে আল্লাহ সব রকমের পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। ওয়ায-নসীহত করেছেন। দৃষ্টান্ত, ঘটনাবলী এবং দলীলাদি পেশ করেছেন। আর এগুলো বারংবার বিভিন্ন আকারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেহেতু মানুষ কঠিন বিতর্ক-প্রিয়, তাই না ওয়ায-নসীহতের তার উপর কোন প্রভাব পড়ে, আর না দলীল-প্রমাণ তার জন্য ফলপ্রসূ হয়।কুরআনে সবকিছুর বিশদ আলোচনার পরেও যদি কেউ শরীয় শূরা ও গণতান্ত্রিক সংসদীয় পরামর্শ কে একই ভেবে গুলিয়ে ফেলে তাহলে তার এটি নিয়ে আরো বেশি ভাবনা চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে।

গণতন্ত্র হলো পাশ্চাত্যের স্বাধীন জাতির বিশৃঙ্খলার আরেক নাম, যার সাথে শরঈ শূরার দূরতম সম্পর্কও নেই। গণতান্ত্রিক সংসদের শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও মান এবং তাদের কার্যপ্রণালী আর ইসলামী রাষ্ট্রের শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও মান এবং কার্যপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করলেই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে আসমান-যমীন ব্যবধান পরিলক্ষিত হবে। গণতন্ত্রে জ্ঞানী-মূর্খ, বোকা-বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ, সৎ-অসৎ, মুসলমান, কাফের, ব্যভিচারী সব ধরনের মানুষের শূরা সদস্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং সব ধরনের মানুষের মতকে গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায় প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

সূরা যুমার আয়াত নং ৯ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

اَمَّنۡ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيۡلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحۡذَرُ الۡاٰخِرَةَ وَ يَرۡجُوۡا رَحۡمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِى الَّذِيۡنَ يَعۡلَمُوۡنَ وَ الَّذِيۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ

অর্থঃ "যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিদজাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না) বল, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে"।

পক্ষান্তরে উম্মতের বাছাইকৃত সেরা জ্ঞানী-গুণী ও বিচক্ষণ মুমিন ব্যক্তিদের নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা গঠিত হয় এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই চূড়ান্ত নয়। কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় বা মত গ্রহণ করা হতে পারে, কখনো সংখ্যালঘিষ্ঠের মতও গ্রহণ করা হতে পারে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের চাইতে সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতামত বেশী কল্যাণকর মনে হয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংসদ সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেকোনো আইন তৈরী করতে পারে। তারা হালালকে হারাম, হারামকে হালাল বলে বিল পাশ করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা স্বাধীন। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরায় এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত বিধানের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা বা মতামত প্রদানেরও কোন সুযোগ নেই। পরামর্শ করা হয় নতুন উদ্ভূত কোন সমস্যা বা বিষয় নিয়ে, যে বিষয়ে কুরআন-হাদিসের বক্তব্য স্পষ্ট নয়।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে সূরা আহযাব আয়াত নং ৩৬ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم ْ

-

অর্থঃ “আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয় চূড়ান্তরূপে ফয়সালা বা মীমাংসা করে দেওয়ার পর সেই ব্যাপারে কোন মু'মিন নর-নারীর জন্য কোনরূপ ইখতিয়ার অবশিষ্ট থাকে না”।

শরীঈ শূরা সদস্যগণ নিজেরা পদপ্রার্থী হতে পারে না; আত্মপ্রচারে জড়িত হতে অক্ষম; কুরআন ও সুন্নাহর ঘোষিত ও স্বীকৃত দোষাবলীর ধারক হতে পারবেন না। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক সংসদের শূরা সদস্যরা নির্বাচনে নিজেরা নিজেদের পদপ্রার্থী হন। আত্মপ্রচারমূলক অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং কোন ঐশী আইনের অনুসরণে নিজ চরিত্র সংশোধনে বাধ্য নন।

মজলিসে শূরাতে পরামর্শ দাতাকে হতে হবে আমানতদার ও বিশ্বস্ত। অপরপক্ষে গণতন্ত্রে ফাসেক নির্বোধ কাফের মুশরিক নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ পরামর্শ দাতার ভূমিকা পালন করে থাকে।

হাদিস থেকে দলীলঃ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْه." ِ

অনুবাদঃ আবূ বকর (রাযি.)..... জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চায়, তখন সে যেন তাকে (সঠিক) পরমর্শ দেয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/৩৭৪৭)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَن" . ٌ

অনুবাদঃ আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ,হা/৩৭৪৫)

عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

অনুবাদঃ আবূ মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হলো তাকে বিশ্বস্ততা রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হলো।(আবু দাউদ হা/৫১২৮, তিরমিযী, হা/২৮২২,)

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَن. " ٌ

অনুবাদঃ ইবনে মুসান্না (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যার থেকে পরামর্শ নেয়া হয়, সে একজন আমানতদারের মত। (সুনানে আবু দাউদ, হা/৫০৪০)

আমীরুল মুমিনীন বা খলীফা সর্বাবস্থায় শূরার রায় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য নয়। কোনো সময় যদি তিনি শূরার রায়কে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত মনে করেন, কিংবা তার তুলনায় অন্য কোনো সিদ্ধান্তকে কুরআন-সুন্নাহ এবং জনসাধারণের উপকার ও কল্যাণের অধিক কাছাকাছি মনে করে, তাহলে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। যেমনঃ খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর ক্ষেত্রে এমনটি পরিলক্ষিত হয়েছে।

কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার প্রধান অধিকাংশের রায় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করতে বাধ্য থাকেন। যদি তার কোনো সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সংসদ সদস্যের বিপরীত হয়, তাহলে তার এ সুযোগ নেই যে, সে অধিকাংশের মতামতকে বাদ দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পরে শূরা সংক্রান্ত ঘটনাঃ

ঘটনা: ১ (উসামা বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা):

হযরত নবী করীম (ﷺ) হযরত উসামা ইবন যায়দ (রাঃ)-কে তাঁর অন্তিম মুহূর্তে সিরিয়া অভিমুখে রোমানদের মুকাবিলা করার জন্য মুসলিম বাহিনীসহ প্রেরণ করেছিলেন এবং হযরত নবী করীম (ﷺ)-এর রোগ বৃদ্ধির কারণে এই বাহিনী যাত্রা বিরতি করেছিল। হযরত নবী করীম (ﷺ)-এর ওফাতের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এই বাহিনী প্রেরণ করতে চাইলেন। সে সময় ২টা ফেতনা আরবের বিভিন্ন দেশ থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিলো। একটি, ধর্ম ত্যাগের ফিতনা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইন্তেকালের পর আরবে ধর্মত্যাগের একটা হিড়িক পড়ে যায় বিভিন্ন জায়গায়। আরেকটা, অনেক মিথ্যা নবীর দাবিদার বের হয়েছিলো যেটা ছিলো খুব ভয়ংকর একটা ফিতনা। কেননা তারা সৈন্য সংগ্রহ করছিলো যুদ্ধ করার জন্য। অবস্থার প্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কিরাম সব দিকে ধর্ম ত্যাগের খবর শুনে এবং মদীনার উপর হামলা করার আশংকা দেখা দেওয়ায় এই বাহিনী প্রেরণ স্থগিত রাখার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট অনুরোধ করেন। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর ঈমানী শক্তি, মনোবল, হিম্মত ও সাহসিকতা, উদ্যম ও দৃঢ়তা পরিমাপ করুন! তিনি সবাইকে সাফ জবাব দিলেন, আমাকে যদি কেউ এ ব্যাপারে নিশ্চয়তাও প্রদান করে যে, এই বাহিনী প্রেরণ করার পর আমাকে মদীনায় কোন হিংস্র জন্তু একাকী পেয়ে ছিঁড়ে ফেলবে তবু আমি বাহিনী প্রেরণ কখনো মুলতবি করবো না। কারণ এ বাহিনী স্বয়ং নবী করীম (ﷺ) প্রেরণ করেছিলেন। অতএব তিনি এই মর্মে নির্দেশ জারি করলেন যে, উসামা বাহিনীতে যেসব লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা যেন যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং মদীনার বাইরে সেনা শিবিরে দ্রুত সমবেত হয়।

ঘটনা:২(ধর্মত্যাগীদের ফিতনা):

হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর যখন যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কিতালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেসময় হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ সমস্ত শূরা সদস্যদের রায় এর বিপক্ষে ছিলো, এই ভয়াবহ নাযুক পরিস্থিতিতে তারা যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পক্ষে ছিলেন

না।কিন্তু আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, "আল্লাহর কসম! যাকাতের একটি জন্তু বা একটি শস্যকণাও যদি কোন গোত্র পরিশোধ না করে, তবে আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো। এ কথা বলে তিনি নিজেই ঘোরার লাগাম ধরে রওনা দেওয়া শুরু করলেন। তাঁকে দেখে সাহাবে কেরাম বুঝতে পারেন যে, আবূ বকর (রাঃ) কতটা দৃঢ়তার সাথে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সেখান থেকে পিছিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই।এটা দেখে উমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আবূ বকরের (রাঃ) অন্তরে বিষয়টির সুস্পষ্ট উপলব্ধি দান করেছেন। পরে আমি বুঝতে পারি, এটিই (আবূ বকর রাযি.-এর সিদ্ধান্তই) সঠিক।[ইসলামের ইতিহাস (১ম খন্ড)-মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী (রহঃ)]

একনজরে শরীঈ শূরা ও গণতান্ত্রিক সংসদীয় পরামর্শনীতির মৌলিক পার্থক্যঃ

শরঈ শূরা পদ্ধতি	**সংসদীয় পরামর্শ পদ্ধতি**
উৎসঃ কুরআন,সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস।	উৎসঃ সংসদ, সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়।
পরামর্শ দাতাঃ মুমিন,মুত্তাকি, আলেম, অভিজ্ঞ, বিশ্বস্ত, আমানতদার।	পরামর্শদাতাঃ সংসদ সদস্যদের যে কেউ পরামর্শ দিতে পারে।অর্থাৎ কাফের, মুশরিক, ফাসেক, অজ্ঞ ইত্যাদি
চূড়ান্ত ফয়সালাঃ শরী'আতের সীমার মধ্যে থেকে খলীফা/ আমীরের ।	চূড়ান্ত ফয়সালাঃ সংসদের অধিকাংশ সদস্যের রায়ের ভিত্তিতে।
উদ্দেশ্যঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের স্পষ্ট বক্তব্য নেই সেখানে রাষ্ট্র ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্মিলিত পরামর্শের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে ন্যায়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।	উদ্দেশ্যঃ জনকল্যাণ ও জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন করা।

উপরোল্লাখিত আলোচনার সাপেক্ষে বলা যায় যে, যার উৎস পরামর্শদাতা, চূড়ান্ত ফয়সালাকারী, লক্ষ্য উদ্দেশ্য একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত সেটি কিভাবে একই

হতে পারে? না হতে পারেনা। সূরা আল আরাফ আয়াত নং ৩ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

অর্থঃ "তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ করো এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করো"।

ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক কেমন? আকাবিরে উলামায় দেওবন্দের অবস্থানঃ

ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের এক কথায় আগুন পানি সম্পর্ক। উভয়টি এক সাথে এক কদমও চলতে পারেনা। যাদের মধ্যে কোনো অবস্থাতেই সুসম্পর্ক বা সমঝোতা সম্ভব ই নয়। প্রচলিত গণতন্ত্রের সবই পশ্চিমা গণতন্ত্র নামক খবীস বৃক্ষ থেকে জন্ম নেওয়া ফল। যেই ফল প্রতিনিয়ত খাওয়ার ফলে শরীরে বিষাক্ত পদার্থ ছাড়া কিছুই জমা হয়না।

এক নজরে গণতন্ত্রের ব্যাপারে আকাবিরে উলামায় দেওবন্দের অবস্থানঃ

✍উসতাযুল হাদিস,মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহিমাহুল্লাহ (আপ কে মাসায়িল আওর উন কা হাল: ৭\৬৫৭) কিতাবে লিখেছেন-

جمہوریت کا نہ صرف یہ کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ اسلام کے سیاسی نظریے کی ضد ہے

অনুবাদঃ "ইসলামের সঙ্গে গণতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং গণতন্ত্র ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং ইসলামের সঙ্গে গণতন্ত্রকে জুড়ে দেওয়া, কিংবা গণতন্ত্রকে ইসলামসম্মত সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ ভুল"।

তিনি আরো লিখেছেন আকাঈদে ইসলাম:১৯৭, খিলাফতে রাশিদা কী তারীফ কিতাবে যে, 'মোটকথা, গণতন্ত্রে জনগণের শাসন, জনগণের জন্য। এই শ্লোগান আসলে নিছক প্রতারণা। আর ইসলামের সঙ্গে এ ব্যবস্থাকে যুক্ত করা প্রতারণার ওপর আরেক

প্রতারণা। আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, যেমন ইসলামের সঙ্গেও গণতন্ত্রের কোনো যোগসূত্র নেই। কারণ, এই দুটি বিষয় একে অপরের বিপরীত আর বিপরীত দুটো বস্তু একত্রিত হতে পারে না'।

✍হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ (মালফুজাতে থানভী: ২৫২; আহসানুল ফাতাওয়া, কিতাবুল জিহাদ, বাব- সিয়াসাতে ইসলামিয়া) কিতাবে লিখেছেন-

غرض اسلام مین جمہوری سلطنت کوئی چیز نہیں ... یہ مخترعہ متعارفہ جمہوریت محض کھڑا ہوا دھو کہ سلہ ہی، بالخصوص ایسی جمہوری سلطنت جو مسلم و کا فرارکان کسی مرکب ہو وہ تو غیر مسلم سلطنت ہی ہو گئی.

অনুবাদঃ 'সারকথা হলো- ইসলামে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলে কিছু নেই। এ প্রচলিত গণতন্ত্র নিছক মনগড়া এক ভাঁওতাবাজি ছাড়া কিছু নয়। বিশেষত এমন কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে মুসলিম ও কাফির উভয় সদস্য একত্রে থাকে-তা নিঃসন্দেহে একটি অমুসলিম শাসনব্যবস্থাই হবে'।'

✍ শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী হাফিজাহুল্লাহ 'হামারা মাআশী নিযাম' কিতাবে পৃষ্ঠা ৮৪ এ লিখেন:

" ہمارے نزدیک 'اسلامی جمہوریت' جس طرح ایک غلط اصطلاح ہے، اسی طرح 'اسلامی سوشلزم' بھی ایک غلط اصطلاح ہے۔ یہ دونوں مغربی لادینی افکار کی پیداوار ہیں"۔

অনুবাদ:"আমাদের দৃষ্টিতে 'ইসলামী গণতন্ত্র' যেমন একটি ভ্রান্ত পরিভাষা, তেমনি 'ইসলামী সমাজতন্ত্র'ও একটি ভ্রান্ত পরিভাষা। দুটোই পশ্চিমা ধর্মহীন চিন্তাধারার থেকে সৃষ্ট ফসল।"

✍ মুফতি তাকী উসমানী হাফিজাহুল্লাহ.” ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত” পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭ এ লিখেন,

مغربی جمہوریت کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ عوام کو حاصل ہے، اور عوام کی اکثریت جس چیز کو چاہے قانون بناسکتی ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے صریح خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نظریہ اسلام کے بنیادی عقیدہ "ان الحکم الا للہ" سے صریح متصادم ہے۔ اس لیے جمہوریت کو اسلامی کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شراب کو اسلامی شراب کہے۔

অনুবাদঃ "পশ্চিমা গণতন্ত্রের মূল দর্শন হলো, সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হাতে। এবং জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যা চায় তাকে আইন বানাতে পারে, যদিও সেটা আল্লাহ তা'আলার বিধানের স্পষ্ট বিরোধী হয়। এই মতবাদ ইসলামের মৌলিক আকিদা 'হুকুম দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ' [সূরা ইউসুফ: ৪০] এর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। তাই গণতন্ত্রকে ইসলামী বলা তেমনই, যেমন কেউ মদকে ইসলামী মদ বলে।"

✍ আল্লামা সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী রহিমাহুল্লাহ মাহেনামা সানাবীলে লিখেছেন-

جمہوریت اور جمہوری عمل کا اسلام سے کیا تعلق ہے ؟ اور خلافت اسلامی سے کیا تعلق؟ موجودہ جمہوریت تو ستر ہویں صدی کی بعد پیدا ہوئی ہے۔ یونان کی جمہوریت بھی موجودہ جمہوریت سے الگ تھی، لہذا اسلامی جمہوریت ایک بے معنی اصطلاح ہے... ہمیں تو اسلام میں کہیں بھی مغربی جمہوریت نظر نہیں آئی اور اسلامی جمہوریت تو کوئی چیز ہی نہیں، معلوم نہیں اقبال مرحوم کو اسلام کے روح میں یہ جمہوریت کہاں سے نظر آگئی ؟... جمہوریت ایک خاص
تہذیب و تاریخ کا ثمرہ، اسے اسلامی تاریخ میں ڈھونڈنا معذرت خواہی ہے.

অনুবাদঃ “গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে ইসলামের কী সম্পর্ক? এবং খেলাফতে ইসলামীয়ার সঙ্গেই বা কী সম্পর্ক? বিদ্যমান গণতন্ত্র তো জন্ম নিয়েছে সতেরো শতকেরও পরে। প্রাচীন গ্রিকের গণতন্ত্রও তো বর্তমান গণতন্ত্র থেকে ভিন্ন ছিল। অতএব, 'ইসলামী গণতন্ত্র' শব্দটিই একটি অর্থহীন পরিভাষা। আমরা তো ইসলামী শরী'আতের কোথাও পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র খুঁজে পাইনি। ইসলামী গণতন্ত্র বলে তো কোনো কিছুই নেই”।

✍ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক সিন্ধলভী (রহ.) 'ইসলাম কা সিয়াসী নিযাম' কিতাবের ২১ নং পৃষ্ঠায় লিখেন:

" حدنیا میں سیاسی نظریات میں جتنے بھی گمراہ کن اور دھوکہ دہی پر مبنی افکار ہیں، ان میں 'جمہوریت' سب سے زیادہ گمراہ کن اور دھوکہ دہی پر مبنی ہے"۔

অনুবাদঃ "দুনিয়াতে রাজনৈতিক মতবাদসমূহের মধ্যে যতগুলো বিভ্রান্তিকর ও প্রতারণামূলক চিন্তাধারা আছে, তার মধ্যে 'গণতন্ত্র' সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তিকর ও প্রতারণামূলক।"

✍ মুফতি মুহাম্মদ রফী উসমানী হাফি. জমহুরিয়্যাত আওর ইসলাম পৃষ্ঠা ২৯,৩০ এ লিখেন,

جمہوریت درحقیقت ایک نیا دین ہے، جس کا پہلا کلمہ یہ ہے کہ "حاکمیت عوام کی ہے"۔ اور اسلام کا پہلا کلمہ یہ ہے کہ "لا الہ إلا اللہ" یعنی حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ اب جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ قانون سازی کا حق عوام کو ہے، وہ اس کلمہ کا منکر ہے۔ جمہوریت اور اسلام دو متضاد دین ہیں، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ جو جمہوریت کو اسلام کا حصہ سمجھتا ہے، وہ دراصل دو دینوں کو خلط ملط کر رہا ہے، جو سراسر گمراہی ہے۔

অর্থঃ গণতন্ত্র মূলত একটি নতুন ধর্ম, যার প্রথম কালিমা হলো 'সার্বভৌমত্ব জনগণের'। আর ইসলামের প্রথম কালিমা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব শুধু আল্লাহর। এখন যে ব্যক্তি এই আকিদা রাখে যে আইন বানানোর অধিকার জনগণের, সে এই কালিমাকে অস্বীকারকারী। গণতন্ত্র ও ইসলাম দুটি পরস্পরবিরোধী ধর্ম, এদের মাঝে কোনো মিল নেই। যে গণতন্ত্রকে ইসলামের অংশ মনে করে, সে মূলত দুই ধর্মকে মিশ্রিত করছে, যা সম্পূর্ণ গোমরাহী।"

✍হজরত মাওলানা শাইখ আব্দুল হক প্রতিষ্ঠাতা দারুল উলূম জামিয়া হক্কানিয়া গণতন্ত্রকে ইসলামের সঙ্গে যুক্তকারীদের প্রতিবাদে স্বীয় ফাতাওয়া হক্কানিয়া:২\৩৫২ লিখেছেন-

'ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করেছে। এটিকে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের সাথে যুক্ত করা ইসলামী ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতারই প্রমাণ'।

ইসলামী বিধান ও তার ঘোষণাবলী কোনরূপ আবর্তন-বিবর্তন, পরিবর্তন- পরিবর্ধন গ্রহণ করে না

আবর্তন-বিবর্তনের গাড়ী ইসলামের উপর থেকে যতই পথ অতিক্রম করে যাক না কেন এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানব জীবনে যতই বিপ্লব হোক না কেন, শরী'আতের বিধানের ঘোষণাবলী কখনোই কোনরূপ বিবর্তন পরিবর্তন সংস্কার ও সংশোধনকে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত নয়। চিরন্তনতার এমন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটি তার মধ্যে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সে গতিশীল এবং প্রত্যেকটি যুগ-যামানা, স্থান ও দেশের উপর পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হবার পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী।

শরী'আতের বিধান সর্বদাই অবিভাজ্য ও বিশ্বজনীন। এর কিছু অনুসরণ এবং কিছু পরিত্যাগ নিষিদ্ধ। এমনিভাবে এর কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনা এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করাও নিষিদ্ধ। এ দিক দিয়ে শরী'আতের বিধানাবলী যেমন অনুসরণীয়, তেমনি শরী'আতের বিষয়ের প্রতিও ঈমান আনা অপরিহার্য। সুতরাং যারা শরী'আতের সমুদয় বিধানের প্রতি ঈমান না আনবে এবং তাকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত না করবে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার রোষানলে পড়বে।

কুরআনুল কারীমে সূরা বাকারা আয়াত নং-৮৫ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

اَفَتُؤۡمِنُوۡنَ بِبَعۡضِ الۡكِتٰبِ وَ تَكۡفُرُوۡنَ بِبَعۡضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنۡ يَّفۡعَلُ ذٰلِكَ مِنۡكُمۡ اِلَّا خِزۡىٌ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۚ وَ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ يُرَدُّوۡنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الۡعَذَابِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ

অর্থঃ "তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনো আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে যারা এমন আচরণ প্রদর্শন করবে তাদের এ ছাড়া

আর কিছুই নাই যে, তারা এ পার্থিব জগতে হবে অপমানিত আর পরকালে নিক্ষিপ্ত হবে কঠোর শাস্তির মধ্যে”।

সূরা আন-নিসা আয়াত নং ১৫০-১৫১ এ আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ و يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا و يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ و وَرُسُلِهِ وَ يَقُو بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

অর্থঃ “যারা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, আর আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে বলে থাকে যে, আমরা কতক মানি আর কতক মানি না, আর তারা এর মাঝে একটিকে বেছে নিতে চায়, তারাই হচ্ছে সত্যিকার কাফির”।

শরী’আতের বিধানের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থা, আচরণ ও রাজনৈতিক বিষয়সহ সকল বিষয় সম্বলিত এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান! তা যুদ্ধ ও সন্ধি অবস্থায়ও এক রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ককে সংগঠিত করে থাকে।

ইসলামী শরী’আত কোন একটি যুগ ও কালের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং সে প্রতিটি যুগ ও কালের জন্য এবং কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বযুগেই কার্যকর। তার আঁচলবিশেষ কোন সময়, যুগ ও দেশের সাথে বাঁধা নয়। এ একটি শাশ্বত জীবন-বিধান।
তাকে ঢালাই করে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, যুগের কোন প্রভাবই তার উপর পতিত হতে পারে না, পারে না তার নতুনত্বের মধ্যে কোনরূপ আবর্তন- বিবর্তন, পরিবর্তন-পরিবর্ধন সৃষ্ট হতে। এর বিধানগুলো এমনই সাধারণ ও সর্বাঙ্গীন এবং সে এমনই স্থিতিস্থাপকতার ধারক যে, প্রতিটি সেই সৃষ্ট নতুন অবস্থা সম্পর্কে আগাম সমাধান দিতেও সক্ষম; যা বর্তমান অবস্থায় সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ কারণেই ইসলামী জীবন বিধানের মধ্যে কোনরূপ আবর্তন- বিবর্তন, পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অবকাশ নেই। গণতন্ত্রের বিধান যেরূপ ওলট-পালট হতে থাকে, ইসলামের বিধান তদ্রূপ কখনো ওলট-পালট হয় না। ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে এ পার্থক্যের মূল কারণ

হচ্ছে যে, ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে , যার কালামের কোনো পরিবর্তন নেই আর গণতন্ত্র মানব রচিত, যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।

لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ . ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থঃ "আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই; সেটিই মহাসাফল্য"।
[সূরা ইউনুস,আয়াত নং-৬৪]

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ

অর্থঃ "আল্লাহর আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না"
[সূরা আন'আম, আয়াত নং-৩৪]

مَا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থঃ তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
[সূরা লোকমান,আয়াত নং-২৭]

কুরআনুল কারীমে সূরা হা-মীম- সিজদাহ আয়াত নং ৪২ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

অর্থঃ "বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত"।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানব রচিত আইনের অসারতা

আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী দৃশ্যমান- অদৃশ্যমান সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাশীল। আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও ক্ষমতার কাছে মানুষের জন্য সর্বযুগে কার্যকর ও ফলপ্রসূ বিধান দেওয়া কোনই মুশকিল কাজ নয়। আর গণতন্ত্রের আইন হচ্ছে মানুষের জ্ঞানজাত ও মস্তিষ্কপ্রসূত আইন। এগুলোকে মানুষ তাদের সাময়িক প্রয়োজনের খাতিরে রচনা করে নেয়। ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান তাদের থাকে না। এদিক দিয়ে মানুষের রচিত আইনের বিধানগুলো সেই অবস্থাকে নিজের মধ্যে আবেষ্টন করে রাখতে পারে না, যেগুলো বর্তমান অবস্থায় হওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকলেও ভবিষ্যৎ কালে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনগুলোর ভিত্তি এ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, তা সমাজের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করে দিবে, সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা চালাবে এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। আর সমাজে মানুষের নিরাপত্তার জন্য কাজ করবে, মানুষের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে। মুসলিম দেশগুলোর সামাজিক ব্যবস্থাপনা ইসলামের উপর (যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে নেই, কিন্তু দর্শন ও আদর্শের দিক দিয়ে) অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত। আর জনসাধারণের অধিকাংশ ইসলামী আকীদায় বিশ্বাসী। সুতরাং সেখানের মানব রচিত গণতান্ত্রিক আইন-কানুনগুলো ইসলামী শরী'আতের সাথে পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারার কথা। কিন্তু বাস্তবে এমনটা নয়। সেগুলো ইসলাম পরিপন্থী হয়ে গিয়েছে। এ কারণে গণতন্ত্রের আইন-কানুনগুলো শুধু ইসলামী বিধানের গণ্ডি-সীমা হতেই খারিজ হয়ে পড়ে না বরং তা সেইসব নীতিমালার বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে, যার উপর গণতন্ত্রের আইন-কানুনগুলো নির্ভরশীল। আর এর দ্বারা সেই উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়, যার জন্য এ আইনগুলোকে রচনা করা হয়েছিল। সুতরাং এ আইনগুলো এমনই যে, এগুলো কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তেমনি শরী'আতের দিক দিয়ে কোন কিছু সফল করতেও পারে না। যদি আমরা ইসলামের মূল বিধান সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও রাখি, তবে এ কথা উপলব্ধি করতে আদৌ কষ্ট হয় না যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য যে আইন-কানুন রচনা করা হয়েছে, সেই আইন-কানুন

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অশান্তি, মতানৈক্য ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে এবং আচার-অনুষ্ঠান ও সভ্যতা সংস্কৃতিকে মিটিয়ে ফেলার কাজ করে। আর এ আইন-কানুনগুলোর প্রতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন্দ্রিক দেশ গুলোর অধিকাংশ জনসাধারণের অসন্তুষ্টি ও অসুখী থাকার এটাই সর্বপ্রথম কারণ নয়। বরং তাদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ মতানৈক্য ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করা উস্কানিদানের একটি অস্ত্র এবং সামাজিক জীবনে হিংসা-বিদ্বেষ, অনৈক্য ও অসুস্থতার ইন্ধন যোগানোর উপকরণে পরিণত হয়েছে। যেই ব্যবস্থার ভিত্তিমূল যখন স্বার্থ উদ্ধার ও স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।

আস-সিজদাহ আয়াত নং ২২ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعۡرَضَ عَنۡهَآۚ إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

অর্থঃ "আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যাকে স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয় আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী"।

মানব রচিত আইন যেখানে যেখানে ব্যর্থ হয়েছে তার বৈশ্বিক চিত্রঃ

মানবরচিত আইন	বৈশ্বিক ফলাফল
সুদ হালাল	ধনী আরো ধনী, গরিব আরো গরিব। ২০০৮ সালে বিশ্বমন্দা। [Great Recession wikipedia] বৈশ্বিক সরকারি ঋণ বেড়ে ১০২ ট্রিলিয়ন ডলার হয়েছে। দরিদ্র/ উন্নয়নশীল দেশের ঋণ ৩১ ট্রিলিয়ন ডলার [UN trade and development report-unctad]

মাদক নীতি (মদ গাঁজা হালাল)	মোট মাদক ব্যবহারকারী ২০২২, সাল ২৯.২ কোটি [UNODC World Drug Report 2024] যার ফলে পরিবার ধ্বংস, নৈতিকতা হ্রাস, ধর্ষণ,খুন বৃদ্ধি।মদ পান করার কারণে ২৬ লক্ষ প্রতি বছর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে (৪.৭%) [সর্বশেষ WHO রিপোর্ট ২০২৪ অনুযায়ী ২০১৯]

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এর শাস্তি জেল জরিমানা,, হত্যার শাস্তি যাবতজীবন ও এক পর্যায়ে ক্ষমা লাভে ফাঁসির আসামীর মুক্তি।	চুরি ডাকাতি বেড়ে যাওয়া, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, আসামী জামিন পাওয়া, বিচারহীনতার সংস্কৃতি সৃষ্টি, খুন বেড়েছে তিনগুণ। ডাকাতি বিশ্ব গড়: ১০৫ প্রতি লক্ষ = ০.১০৫% চুরি অনুমান: ২৫০০ প্রতি লক্ষ = ২.৫% (চুরি ডাকাতির ২৪ গুণ বেশি ঘটে) [UNODC 2017]

নারী পুরুষ সমতার আইন	পরিবার ভাঙ্গন,নারী কর্তৃক পুরুষকে তালাকের হার বৃদ্ধি, নারীরা প্রায় ৭০% তালাক শুরু করে [Michael Rosenfeld, Stanford University 2015 How Couples Meet and Stay Together সার্ভে 2009-2015] নারীর পণ্যে পরিণত হওয়া, নারীবাদ বৃদ্ধি প্রায় ৪০-৫৭% [Ipsos Global]

শিশু অধিকার আইন, গর্ভপাতের বৈধতা, ধর্ষণের শাস্তি জেল	৬৫ কোটি মেয়ে/মহিলা এরা শিশুকালে যৌন নির্যাতনের শিকার। মানে প্রতি ৫ জনে ১ জন মেয়ে [Global estimates of sexual violence against children" - UNICEF, October 2024] বিশ্বের নারী জনসংখ্যার প্রায় ১২.৫%। শিশু ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যা রিপোর্টেড সংখ্যার চেয়ে ৩-১০ গুণ বেশি [UNICEF] । শিশু অধিকার আইন এখানে পুরোই ব্যর্থ। মেয়ে শিশু: ১৪.৯% জীবনে অন্তত ১ বার কন্ট্যাক্ট যৌন নির্যাতনের শিকার সময়সীমা: ১৯৯০-২০২৩ সালের ডাটা স্টাডির সংখ্যা: ৩৩২টা স্টাডি, ৬৮ টা দেশের [Prevalence of sexual violence against children and age at first exposure: a global analysis by location, age, and sex (1990-2023)"The Lancet, Published online September 2024]

	বছরে ৭ কোটি গর্ভপাত অর্থাৎ ৭ কোটি শিশু হত্যা।১৯৭৩-২০২৫, প্রায় ২০০ কোটি শিশু হত্যা [prolife, Guttmacher Institute, WHO,2020]

জাতিসংঘ আইন- বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা (যুদ্ধ ঠেকানো), মানবাধিকার রক্ষা, খাদ্য ,স্বাস্থ্য, ফিলিস্তিন ইস্যু ।	১৯৪৫- ২০২৫ পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় ২৫ কোটি মানুষ মরেছে। এটা শুধু যুদ্ধে নিহত না "Democide" অর্থাৎ সরকার কর্তৃক নিজ দেশের নাগরিক হত্যা, গণহত্যা, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি, ক্যাম্পে মৃত্যু সব মিলিয়ে।[R.J. Rummel - University of Hawaii রিপোর্ট: Death By Government 1994, 1945-2000- University of Maryland এর CISS গবেষণা অনুযায়ী ২০ শতকে, বিভিন্ন United Nations রিপোর্ট]। ফিলিস্তিন কাঁদছে ৭৫ বছর ধরে, [সরকারি হিসাব: ৭০০০০-৭২০০০+ নিহত নভেম্বর ২০২৫ - এপ্রিল ২০২৬। বৈজ্ঞানিক হিসাব: প্রায় ৭৫,২০০ সহিংস মৃত্যু জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত, GHM থেকে ৩৫-৪১% বেশি [United Nations] Gaza Mortality Survey, The Lancet Global Health 2025: প্রায় ৭৫,২০০ "সহিংস মৃত্যু" – ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ৫ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত। ৫৬.২% নিহত নারী, শিশু, বয়স্ক। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ২০২৫ রিপোর্ট অনুযায়ী আহত- ১,৭২,১৩৪+ [Reuters]

	প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা ।খাদ্য সংকট ৯৬%, ১৫০,০০০ বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস। ৬০% আবাসিক বাড়ি, ৮০% বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস।১২৩ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি ধ্বংস, ৩৩৫টি ক্ষতিগ্রস্ত। পানির উৎস ৭০০+ ধ্বংস, ৭৫,০০০ টন বোমা ফেলা হয়েছে গাজায়। ধ্বংসস্তূপ ৪২ মিলিয়ন টন।ক্ষতির পরিমাণ: $৩৩ বিলিয়ন।[Aljazeera report] ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ,আসামে সংখ্যালঘু নির্যাতন।আসাম: উচ্ছেদ, National Register of Citizens(NRC)ও ডিটেনশন। বুলডোজার উচ্ছেদ ২০২৫,জুন জুলাই- ৬০০০+ মুসলিম [Reuters], NRC ২০১৯- ৭০% বাঙালি মুসলিম , প্রায় ১৯ লক্ষ [Reuters], ডিটেনশন ক্যাম্প-৬ টি জেল-ক্যাম্পে ১০০০+ বন্দি [Minority Rights Group], বাংলাদেশে পুশব্যাক- ১৮৮০+ ,২০২৫ এ [Business Standard], গরু ভিজিলান্টি- মুসলিম ভিকটিম ৮৪%, ২০১৪ মে এর পর ৯৭% [Indiaspend database], সরকারি হিসাব ধর্মীয় কারণে ১০০০০+ মুসলিম নিহত।শেষ ডাটা ২০১৩,অনেক মৃত্যুর রিপোর্ট হয়না।[Wikipedia] চীনে সংখ্যালঘু “উইঘুর” দমন নিপীড়ন

	নির্যাতনের শিকার যেমনঃ জোরপূর্বক শ্রম, জেল, ধর্মীয় দমন, দেশান্তরে দমন ।[United Nations, Human Right watch,Center of Uyghur Studies, Uyghur Human Right Project]

যিনা, ব্যভিচার,সমকামিতা বৈধ এবং ১৮ বছরের পূর্বে বিয়ের জেল জরিমানার আইন।	১২৯ টি দেশে সমকামিতা বৈধ। [OHCHR 2024"Over two-thirds of countries now do not criminalize LGBT people"] [Wikipedia - LGBTQ rights by country", "Human Dignity Trust + Commonwealth Lawyers Association" 2015] ফলাফলঃপরিবার প্রথা ভাঙ্গন, এইডস-গনোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি, বংশ বিলুপ্তি, জারজ সন্তান বৃদ্ধি, অশ্লীলতা, নৈতিক অবক্ষয়।

মানবরচিত আইনের অসারতা: এইডস/এইচআইভি ও গনোরিয়ার বৈশ্বিক পরিসংখ্যানের আলোকে একটি দৃষ্টিপাত:

এইডস/এইচআইভি	**গনোরিয়া**
মোট আক্রান্ত: ২০২৪ সালের শেষে বিশ্বে ৪০.৮ মিলিয়ন মানুষ HIV নিয়ে বেঁচে ছিল।এর মধ্যে ১.৪ মিলিয়ন শিশু।নতুন সংক্রমণ: ২০২৪ সালে ১.৩ মিলিয়ন মানুষ নতুন করে HIV-তে আক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যু: ২০২৪ সালে ৬,৩০,০০০ মানুষ HIV-	নতুন সংক্রমণ: WHO এর ২০২০ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ৮৬.৯ মিলিয়ন নতুন গনোরিয়া সংক্রমণ হয়েছিল ১৫-৪৯ বছর বয়সীদের মধ্যে। ২০২৪ এর আপডেটেড গ্লোবাল ফিগার এখনো প্রকাশ হয়নি, কিন্তু WHO বলছে প্রতিদিন ১ মিলিয়নের বেশি

সম্পর্কিত কারণে মারা গেছে। [World Health Organization. _HIV Data and Statistics_. 2024. UNAIDS. _Global HIV & AIDS statistics — Fact sheet_. 2024.]	কিউরেবল STI হয়, যার বড় অংশ গনোরিয়া। [World Health Organization. _Sexually Transmitted Infections (STIs)_. 2024]

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, WHO নিজেই বলেছে যে একাধিক যৌনসঙ্গী, অরক্ষিত যৌনতা এবং পুরুষে-পুরুষে যৌন সম্পর্ক HIV ও অন্যান্য STI এর প্রধান রিস্ক ফ্যাক্টর। অর্থাৎ যে আচরণগুলোকে অনেক দেশের মানবরচিত আইন বৈধতা দিয়েছে, সেগুলোই রোগ বিস্তারের মূল চালিকাশক্তি।মানবরচিত আইন "Sexual Offences Act / Decriminalization Laws, Public Health Act / Harm Reduction Policy, Anti-Discrimination Laws / LGBTQ Rights" ইত্যাদি যৌন নৈতিকতার সীমারেখা শিথিল করার পরও জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে বাস্তবতা স্পষ্ট যে, আইন বদলালেই মানুষের প্রবৃত্তি ও তার ফলাফল বদলায় না। ইসলাম যে ফিতরাতি সীমারেখা নির্ধারণ করেছে, তার বাইরে গেলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই স্বাস্থ্য ও নৈতিক সংকটে পড়ে।

এ থেকে খুব সহজেই বোধসম্পন্ন যে কারো ই বুঝতে পারার কথা যে, যেই গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মানব রচিত আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ; জাতিসংঘ সহ অন্যান্য সংঘ মানুষের জান, মাল, ইজ্জত, মানুষের মানবাধিকার, স্বাস্থ্য, সমাজ ও দেশের নিরাপত্তা, শান্তি, বজায় রাখতে চরমভাবে ব্যর্থ হয় সেই গণতন্ত্র আর যাই হোক, কখনোই কোনো জীবনব্যবস্থার আদর্শ হওয়া তো দূরের কথা , সেটি কোনোভাবেই নামমাত্র স্বীকৃতি লাভের ও যোগ্যতা রাখেনা। তাছাড়া এই তন্ত্রে নেই বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। গণতন্ত্রে এগুলো দলতন্ত্রের কাছে পরাভূত হয়। এই গণতন্ত্র নামক মন্ত্রে মানবরচিত আইন তো অনেক আছে, সেইসাথে আছে মিথ্যা আশ্বাস কিন্তু বাস্তবে আইনের কোনো প্রয়োগ নেই। আইন কদাচিৎ প্রয়োগ হলেও সেটির শাস্তি এতই ছোট যে, অপরাধী বারংবার একই অপরাধ করার সাহস পায় এবং জামিনে ছাড়া পেয়ে এসে আল্লাহর যমীনে দম্ভের সাথে চলাফেরা করে বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি

করে। অপরাধী মানবরচিত আদালতে দায় স্বীকার করার পরেও তাকে বাঁচিয়ে রাখার যে সিস্টেম সেটাই গণতন্ত্রের বিচারব্যবস্থা।

ইসলাম ও গণতন্ত্র: একটি তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামী শরী'আত মানব রচিত গণতন্ত্রের আইন-কানুন হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামী শরী'আত মানুষের সমস্যার সমাধান দেয়। মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে জীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান ইসলামের নিকট হতে গ্রহণ করা-সে সমস্যা পার্থিব হোক বা পারলৌকিক হোক। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তার থেকে সমাধান ও ফয়সালা গ্রহণ করার অঙ্গীকার করেছে তাদের জন্য গায়রুল্লাহ্ আইন-কানুন, শাসন ও বিচার-ফয়সালা মেনে নেওয়া বৈধ নয়।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্ব মানুষের, সেখানে মানুষ গোলামি করে মানুষের। কিন্তু ইসলাম এবং কেবল ইসলামেই প্রতিটি মানুষ এই ধরনের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর গোলামি করে। সার্বভৌমত্ব এবং চূড়ান্ত আইনপ্রণয়ন এক আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করে। এভাবে সৃষ্টির আনুগত্য থেকে বের করে এনে মানুষকে স্রষ্টার প্রতি অনুগত করে।এটাই মানুষের সত্যিকার মুক্তি, এটাই হলো মানুষের জন্ম। সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পরই কেবল প্রকৃত অর্থে মানুষের জন্ম হয়। এ দাসত্ব বিশ্বাস কিংবা বিবেকের হতে পারে কিংবা হতে পারে আইনকানুন, আচরণ কিংবা জীবনব্যবস্থারও।

গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা মানুষকে এই স্বাধীনতা দেয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে জীবনব্যবস্থা এবং সংবিধানকে নিজেদের জন্য পছন্দ করবে সেটিই তাদের সংবিধান হিসাবে গণ্য হবে। তারা যা ইচ্ছা হালাল করবে, আর যা ইচ্ছা হারাম করবে। আর প্রকৃত সাংবিধানিক রাষ্ট্র সেটিকেই বলা হবে যাতে দেশের জনগণের অধিকার পূর্ণভাবে রয়েছে। আর যদি কোন রাষ্ট্র জনগণের এই অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান না করে তাহলে গণতান্ত্রিক আইনে সে দেশ গণতান্ত্রিক বলার উপযুক্ত থাকে না। এখানে অধিকাংশের রায়ের ওপর ভিত্তি করে শাসনকার্য পরিচালিত হয় এবং এ শাসনব্যবস্থার মূল দর্শন হলো ক্ষমতার উৎস আল্লাহ নয়; জনগণ। অর্থাৎ মানুষের শাসনক্ষমতা।

জীবনের সর্বস্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনের নাম ‘গণতন্ত্র’। যেমন— প্রাণ ছাড়া প্রাণী হয় না, জনমত তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব ছাড়াও তেমনি গণতন্ত্র হয় না। এটাই গণতন্ত্রের মূলভিত্তি।

গণতন্ত্রে শাসকরা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়। ইলম ও পরহেযগারীতে মানুষের মাঝে তারতম্য হলেও গণতন্ত্রে জ্ঞানী, মূর্খ থেকে শুরু করে ফাসেক জালিম, মুত্তাকি, মুশরিক, কাফের, বোকা, বুদ্ধিমান, ব্যভিচারী, নেশাগ্রস্ত, মুনাফিক অর্থাৎ সর্বস্তরের প্রত্যেকের নিজ নিজ মতামত প্রদানের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে । মানুষের বিবেক ও প্রবৃত্তি যেটাকে অসাংবিধানিক বলবে সেটা অবৈধ। আর যেটাকে সাংবিধানিক বলবে তা বৈধ হিসেবে পরিগণিত হবে।

অথচ আল্লাহ তা'আলা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা স্পষ্ট অপরাধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। এবং তা করতে নিষেধ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহাফ, আয়াত নং ২৬ এ ইরশাদ করেছেন:

وَّ لَا يُشۡرِكُ فِىۡ حُكۡمِهٖۤ اَحَدًا

অর্থঃ "এবং আল্লাহ তাঁর হুকুমের/ কর্তৃত্বের মধ্যে কাউকে শরীক করেন না” ।

মহান আল্লাহ তা’আলা কুরআনুল কারীমে সূরা ইউনূস, আয়াত নং ৫৯ এ অনাধিকার চর্চার বিষয়ে সর্তক করে বলেন,

قُلۡ اَرَءَيۡتُمۡ مَّاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ لَكُمۡ مِّنۡ رِّزۡقٍ فَجَعَلۡتُمۡ مِّنۡهُ حَرَامًا وَّ حَلٰلًا ؕ قُلۡ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمۡ اَمۡ عَلَى اللّٰهِ تَفۡتَرُوۡنَ

অর্থঃ “(হে নবী আপনি) বলুন! তোমাদের ধারণা কী তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে নিজেদের মনমতো হালাল হারাম বানাবে? আপনি বলে দিন আল্লাহ কি তোমাদের এরূপ করার অনুমতি দিয়েছেন? বরং তোমরা আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপ করছো।"

পরম সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ। নৈতিকতার কোনো বালাই গণতন্ত্রে নেই। দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের চরিত্রের কোন শর্ত নেই। কিন্তু ইসলামে শাশ্বত আদর্শ ও নৈতিক মানসম্পন্ন মতামত সম্মানিত। অনৈতিক মতামত/ ধারণা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফতে ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয় বরং মানুষের সার্বিক জীবনে ধর্মের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে। রাষ্ট্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ধর্মের নীতিমালা অনুসরণ করে চলে। হযরত উমর (রাঃ) আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর দায়িত্ববোধ সম্পর্কে বলেন,

لَوْ مَاتَتْ شَاةً عَلَى شَطَ الْفُرَاتِ ضَائِعَةً لَظَنَنْتُ أَنَّ اللهُ تَعَالَى سَائِلِي عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি বকরিও হারিয়ে গিয়ে মারা যায়, আমার ধারণা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সে ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন"। [ইবনে সা'দ - আত-তাবাকাতুল কুবরা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০৫]

গণতন্ত্রে নারী পুরুষ উভয়েই শাসক হতে পারে, মুসলিম হওয়াও জরুরি নয়। কিন্তু ইসলামে শাসককে মুসলিম এবং পুরুষ হতে হয়।

আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসা আয়াত নং ৩৪ এ ইরশাদ করেছেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

অর্থঃ পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এক-কে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এইজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا :
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

অনুবাদঃ আবূ বকর (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বলেছেন: "যে জাতি তাদের শাসনভার কোনো নারীর হাতে অর্পণ করে, তারা কখনোই সফলকাম হবে না।" [সহীহ বুখারী হা/৪৪২৫; সুনান তিরমিযী হা/২২৬২, মিশকাতুল মাসাবীহ হা/৩৬৯৩]

গণতন্ত্রে পদ প্রার্থনা করাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সরকারী বা বেসরকারী যে কোন পদ চেয়ে নেওয়া বা পদের লোভ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। কারণ পদ বা শাসন ক্ষমতা হলো দায়িত্ব, আমানত; অধিকার নয়। তাই স্বার্থসিদ্ধি বা নিছক নেতৃত্ব দেওয়া অথবা শুধু পদ নেওয়ার জন্য নির্বাচনে অংশ নেওয়া বা এর জন্য প্রাণপণ তদবীর করা জায়েয নেই। কেননা যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় পদ গ্রহণ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সাহায্যের দরজা রুদ্ধ হয়ে যায়। তার দ্বারা দেশ ও জনগণের মঙ্গল হয় না।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. "

অনুবাদঃ শায়বান ইবনে ফাররুখ (রহঃ) ....আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে, আব্দুর রহমান! তুমি শাসন ক্ষমতা চাইবে না। কেননা, যদি তুমি তোমার চাওয়ার মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হও, তবে তার দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে। আর যদি তুমি চাওয়া ব্যতীত তা প্রাপ্ত হও, তবে এ ব্যাপারে তুমি (আল্লাহর তরফ থেকে) সাহায্য প্রাপ্ত হবে।[সহিহ মুসলিম হা/৪৫৬৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا
إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

অনুবাদঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, অচিরেই তোমরা নেতৃত্ব ও দায়িত্বের লোভ করবে এবং কিয়ামতের দিন তা অনুতাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে। [বুখারী হা/৭১৪৮]।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

অনুবাদঃ হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (ﷺ) এর কাছে আরজ করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি আমাকে কোন স্থানে হাকীম বা ওলী কেন বানিয়ে দেন না? রাসূল (ﷺ) [মুহাব্বতের সাথে] তার স্বীয় হাত আমার কাঁধের উপর রাখলেন। আর বললেন, আবূ জর! তুমি নরম মনের মানুষ। আর এটি হল একটি বড় আমানত। [যা আদায় করা খুবই জরুরী।] নতুবা কিয়ামতের দিন তা লজ্জায় ফেলে দিবে। তবে যে ব্যক্তি এটি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং তা আদায় করতে পারে তার বিষয়টি ভিন্ন। [সহীহ মুসলিম, হা/১৮২৫]

এখানে লক্ষণীয় যে, কেউ কেউ নেতৃত্বের আবেদন জায়েয হওয়ার উপর হযরত ইউসুফ (আঃ) এর বক্তব্য দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন, যখন তিনি মিশরের বাদশাহকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন-

ۖقَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم অর্থঃ "আমাকে ভূভান্ডারের জন্য ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করুন। নিশ্চয় আমি সংরক্ষক এবং বিজ্ঞ।" (সূরা ইউসুফ: ৫৫)

এমনকি কেউ কেউ উক্ত বক্তব্য দ্বারা নির্বাচনী প্রচারণায় নিজের চতুর্মুখী প্রশংসার পক্ষে বৈধতার দলীল দেওয়ার প্রচেষ্টা চালান কিন্তু দুই কারণে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর উক্ত বাণী তাদের পক্ষে দলীল হবে না।

প্রথমত: মিশরের বাদশা তাঁর জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্ত ও আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানসূলভ পরামর্শে মুগ্ধ হয়ে পূর্বেই এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, তাকে মিশরের কোন একটি দায়িত্ব প্রদান করবেন। যেমনটি কুরআনে এসেছে-

وقال الملك التوني به استخلصة لنفسي فلما كلمة قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِين ۖ

অর্থঃ “এবং বাদশাহ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের একনিষ্ঠ বানাবো। সুতরাং যখন ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর কাছে এলেন এবং বাদশাহ তাঁর সাথে আলোচনা করে বললেন, নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসেবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন।” (সূরা ইউসুফ: ৫৪)

সুতরাং বাদশাহ তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে পদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি বরং নিজের ইচ্ছাতেই এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এছাড়া হযরত ইউসুফ (আঃ) এরও এ ব্যাপারে পূর্ণ ধারণা হয়ে গিয়েছিলো যে, বাদশাহ তাঁকে কোন না কোন পদ দিবেন। বাকি ছিল শুধু এতটুকু যে, তাঁকে কোন ধরনের পদ দেওয়া হবে এবং কী কাজ তাঁকে ন্যস্ত করা হবে। এ অবস্থায় হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছেন যে, যখন আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেনই যে, আমাকে কোন না কোন দায়িত্ব দিবেন তাহলে আমাকে ভূভান্ডারের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করুন। বিষয়টি এ রকম ছিল না যে, জেলখানা থেকে তিনি কোন পদের জন্য দরখাস্ত করেছেন। এবং সে মর্মে কোন সুপারিশ পেশ করেছেন। (বরং আগত দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতে মিসরবাসীদের জন্য তাঁর মত একজন আমানতদার ও বিজ্ঞ ভূভান্ডার তত্ত্বাবধায়কের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল) অতএব উক্ত ঘটনা থেকে ক্ষমতা প্রার্থনার কোন বৈধতা প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয়ত: পদপ্রার্থনা নাজায়েয এটি শরী'আতের একটি মৌলিক বিধান। তবে কিছু কিছু পরিস্থিতি এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনা সেই ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। (ইসলাম আওর সিয়াসী নযরিয়াত, আল্লামা তকী উসমানী দাবা। ১৯৯, কুতুবখানা নাঈমিয়া, দেওবন্দ, ভারত)।

যেমন কোন যোগ্য আমানতদার ব্যক্তি যদি একথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে, যদি সে নির্দিষ্ট পদ তলব না করে, তাহলে সে পদে এমন লোক আসবে যার হাতে জনগণ ও দ্বীনের ক্ষতি হবে এবং বদদ্বীনি ছড়াতে থাকবে এ অবস্থায় তার জন্য পদের আবেদন করার অবকাশ রয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে উদ্দেশ্য হতে হবে সমাজ সংশোধন, সম্মান হাসিলের উদ্দেশ্য হলে চলবে না।

হযরত আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (রহঃ) বলেন- ধন-সম্পদ, নেতৃত্ব ও মর্যাদার মোহে পদপ্রার্থনা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। তা শুধু অন্তরে হোক অথবা মৌখিকভাবে হোক। কারণ তা দ্বীনের জন্য হয় না বরং দুনিয়ার জন্যই হয়ে থাকে। আর যদি পদপ্রার্থনা নেতৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে না হয়ে জনগণের কল্যাণার্থে, ন্যায়নিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য হয়, তাহলে তা নিষিদ্ধ নয় বরং ন্যায়নিষ্ঠার কারণে তা হবে উত্তম প্রতিদানের মাধ্যম স্বরূপ। সুতরাং এক্ষেত্রে অন্তরে ও মৌখিকভাবে সর্বাবস্থায় পদপ্রার্থনা বৈধ হবে। যার দলীল নবীজী (ﷺ) এর একটি হাদীস, 'ঈর্ষা শুধু দুই ব্যক্তির উপর করা যায়। প্রথম ঐ ব্যক্তির উপর যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদের প্রাচুর্য দান করে তা হকের পথে ব্যয় করার তাওফীক দিয়েছেন। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে তা অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার-মীমাংসা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।" (সহীহ বুখারী: ১/১৭, মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত)

পরিশেষে যফর আহমদ উসমানী (রহঃ) বলেন,

نفم كان على قدم التواضع مع الله سؤاله الإمارة، هو كما شأن الأنبياء والكمل من الأولياء يجوز له سؤالها وطلبها لم ومن يقدر على الجمع بينهما لم يجز له إرادتها ولا طلبها، ولا الحرص عليها فضلا عن سؤالها باللسان

সুতরাং কেউ যদি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে পদপ্রার্থী হয়, যা ছিল স্বয়ং নবী ও ওলীগণের গুণ, তাহলে তার জন্য পদপ্রার্থী হওয়া জায়েয। আর যে ব্যক্তি দু'টির (পদ প্রার্থনার সাথে বিনয় ও নম্রতার) মাঝে সমন্বয় সাধনে সক্ষম হবে না তার জন্য মৌখিকভাবে পদপ্রার্থনা বৈধ হওয়া তো দূরের কথা, আশা করাও বৈধ হবে না।" (ই'লাউস সুনান: ১৫/৪৮, দারুল কিতাবিল ইলমিয়া) [দরসুল ফিকহ- ১ম খন্ড,লিখেছেন- মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন শেরপুরী]

গণতন্ত্রে মানব রচিত আইন দ্বারা বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু ইসলামে আল্লাহ প্রদত্ত আইন দ্বারা বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত। এমন হতে পারে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর বিধান ও মানব রচিত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যেতে পারে। তবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কুরআন-সুন্নাহ এ হিসেবে পালনীয় হয় না যে, এটা আল্লাহ

ও তাঁর রাসূলের আদেশ। বরং এটা এজন্যই পালনীয় হয় যে, সংসদ সদস্যরা এটাকে পালনযোগ্য মনে করেছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ ব্যবস্থায় মানুষের চাহিদা ও বুদ্ধি কুরআন-সুন্নাহ থেকেও বেশি মূল্যবান। (নাউযুবিল্লাহ)।

গণতন্ত্রে রাজনীতি চলে বহুদলীয় পদ্ধতিতে। এখানে রাজনৈতিক দল অপরিহার্য, রাজনৈতিক দল হচ্ছে একটি দেশের জনগোষ্ঠীর সেই অংশ যারা একটি আদর্শ বা কিছু নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল সরকার গঠন করে। নির্বাচিত দল শাসনকার্য পরিচালনায় দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর জনগণের চাওয়া পাওয়াকে নিমেষেই ছুঁড়ে ফেলে দেয় ময়লার ভাগাড়ে। ভোটে পরাজিত দল বা দল সমূহ বিরোধী দলে থেকে সরকারের সমালোচনা করে। এটি ছাড়া সংসদ অচল। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতে বহু দল, মত ও ধর্মের উপস্থিতি থাকলেও রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থায় বহুদলীয় ব্যবস্থাপনা স্বীকৃত নয়। কেননা তাতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা উম্মাহর দায়িত্বশীল বা খাদেম হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি বিশেষ কোন দলের লোক হন না।

গণতন্ত্রের বাহন হচ্ছে নির্বাচন। আর নির্বাচন হলো জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের পদ্ধতি। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ।মূলত এই রক্ষাকবচটিও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় খুব ই ভঙ্গুর। যার ফলস্বরূপ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্বাচনে ভোট কারচুপি, প্রকাশ্যে হত্যা, দখলদারিত্ব, বাক স্বাধীনতা হরণ, সত্য কথা বললেই টুটি চেপে ধরা, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো ইত্যাদি এসব এমন কিছু বাস্তবতা যা সকলের ই জানা; এগুলো সাব্যস্ত করার জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। দিনের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জন্য যদি দলিল লাগে তাহলে বিবেকে আর কিছু ধরবে না। এখানে দেওয়া হয় শুধু সহমত প্রকাশের স্বাধীনতা । দ্বিমত প্রকাশের স্বাধীনতার অকাল মৃত্যু ঘটে প্রতিনিয়ত। এ ব্যবস্থায় মানুষ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হতে বাধ্য।কিন্তু ইসলাম তার অনুসারীদের দিয়েছে বিবেকের স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। তা চিন্তা-বিশ্বাসের ও বাকস্বাধীনতার জন্য নীতি-নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর ইসলামে কখনোই স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوتِ وَ الْأَرْض. ِ

অর্থঃ “হে নবী! আপনি তাদের বলে দিন যে, আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করো।” [সূরা ইউনুস: ১০১]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান বা শাসক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সার্বিক যোগ্যতা ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান যতদিন যোগ্যতা ও সক্ষমতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবেন ততদিন ঐ দায়িত্বে বহাল থাকবেন। গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে মানব রচিত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি, আর ইসলামী বিশ্বাসে আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।

➔ কুরআন ও হাদিসের আলোকে গণতন্ত্রের মুখোশ উম্মোচনঃ

ইসলামী শরী’আতে কুরআন সুন্নাহের আলোকে হদ/হুদুদ, তা’যির ,দিয়াত ও কিসাস প্রয়োগের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়।

ইসলামী শরী’আতের পরিভাষায় হুদুদ বলা হয় গুনাহ ও অপরাধ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য মহান প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি, যাতে অপরাধী তার অপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয় এবং অন্যরা তাকে দেখে শিক্ষা নেয়। এই শাস্তি কুরআন বা হাদিস দ্বারা নির্দিষ্ট। তবে তা কার্যকর করার দায়িত্ব সরকারের। এক্ষেত্রে বিচারক বা সরকারের নিজস্ব মতামতের কোনে সুযোগ নেই।সাত ধরণের অপরাধকর্মে হদ অবধারিত হয়- চুরি, ব্যভিচার-ধর্ষণ, ডাকাতি-
রাহজানি, মদ ও মাদকদ্রব সেবন, ইসলাম ত্যাগ বা রিদ্দাহ,ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ, বৈধ খলীফার বা আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

তা'যিরঃ যেসব অপরাধের শাস্তির কোনো পরিমাণ নির্ধারিত হয়নি। বিচারকের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিচারক স্থান, কাজ ও পরিবেশ বিবেচনা করে

অপরাধ দমনের জন্য যেমন এবং যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করেন ততটুকুই দিবেন। শরী'আতের পরিভাষায় তাকে তা'যির বলা হয়। তা'যিরের কতক শাস্তি নিম্নরূপ- হত্যা,বন্দি করা,বেত্রাঘাত, অপমান করা,দেশান্তর করা,বরখাস্ত করা,কোনো কিছু ক্ষয় বা নষ্ট করে দেওয়া,ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দেওয়া। কুরআন-সুন্নাহয় কেবল নির্ধারিত কিছু অপরাধের কথা উল্লিখিত রয়েছে। তবে তা'যিরের আওতাভুক্ত আরো অনেক অপরাধ এমন রয়েছে যা কুরআন-সুন্নাহতে অনুক্ত রয়েছে। যে সকল অপরাধের কারণে তা'যিরের বিধান আরোপিত হয়, তার কতক এই- সমকামিতা,শ্লীলতাহানি, পায়ুপথে ব্যভিচার,মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ,ঘুষের আদান-প্রদান,আমানাতের,খিয়ানাত,
সুদের আদান-প্রদান,কোনো সাহাবীকে গালি দেওয়া,অপহরণ, জবরদখল, ছিনতাই, লুণ্ঠন, ধর্ষণ প্রভৃতি, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা ইত্যাদি।মুসলিম বা অমুসলিম কর্তৃক মুসলমানের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি, নির্দোষ কারো উপর সমকামিতা ব্যভিচার ছাড়াও অন্যকিছুর অপবাদ আরোপ,চৌর্যবৃত্তি (যদি তা এমন পর্যায়ে না পৌঁছে যে, তার হাত কেটে ফেলা বৈধ হয়)।

দিয়াত বলা হয় প্রাণ বা কোনো অঙ্গের বিনিময়ে ধার্যকৃত অর্থদণ্ডকে।

কিসাস"- শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। শরী'আতের পরিভাষায় 'কিসাস' বলা হয় হত্যা ও আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যতটুকু যুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা । এই শাস্তি কুরআন বা হাদিস দ্বারা নির্দিষ্ট। তবে তা কার্যকর করার দায়িত্ব সরকারের। এক্ষেত্রে বিচারক বা সরকারের নিজস্ব মতামতের কোনে সুযোগ নেই। [কিতাবুল ফিকহ-২য় খন্ড ইসলামিক অনলাইন মাদরাসা]

গণতন্ত্রের দ্বারা পতিতাবৃত্তির বৈধতা, গর্ভপাতের বৈধতা, সমকামিতা, অভিশপ্ত সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও আর্থিক লেনদেন, অবৈধ ব্যবসা, জুয়ার লাইসেন্স দেওয়া ইত্যাদিকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নারী পুরুষ সমঅধিকার, যিনা, ব্যভিচার ও মদ্যপানকে মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মোড়কে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে, এগুলোর জন্য কোনো শাস্তি নেই গণতন্ত্রে।

ইসলামী শরী'আতে ব্যভিচার সর্ব অবস্থায় হারাম ও অবৈধ। ইসলামী শরী'আতে যিনা ব্যভিচারের স্পষ্ট কঠোর শাস্তির বিধান আছে।যিনার শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত ও যিনার অপবাদের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত। কারণ ব্যভিচার এমন এক মারাত্মক অপরাধ, যা সমাজের নৈতিক চরিত্রের মূল শিকড়টিকেই কেটে দেয়। আর নৈতিক চরিত্রের জগতেই যখন নৈরাজ্য ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তখন সমগ্র সমাজের ভিত্তিই ভেঙ্গে পড়ে। গণতন্ত্রে ধর্ষণ ব্যভিচার শুধু তখনই অপরাধের কাজ যখন কোন এক পক্ষের উপর জবরদস্তি করা হয়। অর্থাৎ এখানে ব্যভিচারী আসল অপরাধ নয়; বরং জবরদস্তি করাটা হচ্ছে অপরাধ। দু'পক্ষের সম্মতিতে এখানে সতীত্বহানিও বৈধ হয়ে যায়, তখন এটাকে নাম দেওয়া তথাকথিত প্রেম ভালোবাসা আর এমন পারস্পরিক সম্মতি অবস্থায় মানব রচিত গণতন্ত্র ব্যভিচারের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তার নিরাপত্তা বিধানকারীতে পরিণত হয়। এমনকি জোর জবরদস্তিকারী ধর্ষকের/ ব্যভিচারীর শাস্তি কদাচিৎ হলেও এরূপ শাস্তি প্রদান করা হয় যে, ধর্ষক পুনরায় জেল থেকে ছাড়ে পেয়ে জঘন্য কাজটি করার বারংবার দুঃসাহস দেখায়। যার দরুণ প্রতিনিয়ত এর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এগুলো আল্লাহর বিধানের স্পষ্ট সীমালঙ্ঘন।

গণতন্ত্রে অর্থনেতিক স্বাধীনতার নামেও সব কিছু অনুমোদিত । এমনিভাবে মদ্যপান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন অপরাধের কাজ নয় এবং এর ফলে সৃষ্ট পাগলামী ও মাতলামীও ধর্তব্য অপরাধ নয়। অবশ্য মাতলামী অবস্থায় যদি কাউকে গালিগালাজ বা মারপিট করে বা কারো সম্মানহানি করে অথবা সে জনসাধারণের মধ্যে এমনভাবে চলতে থাকে যাতে তাদের অসুবিধা সৃষ্টি হয়, কেবল এমন অবস্থায় গণতন্ত্রের আইন হস্তক্ষেপ করে থাকে।

গণতন্ত্র আল্লাহ কর্তৃক বৈধ বিষয়কে অবৈধ সাব্যস্ত করেছে, গণতন্ত্রে ১৮ বছরের পূর্বে বালেগ বালেগার অভিভাবকের সম্মতিতে বিয়ে অনুষ্ঠিত হলেও তাকে বাল্যবিবাহ নামকরণ করে শাস্তি প্রদান অর্থাৎ জেল জরিমানা করার আইন জারি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের বালেগ হওয়ার বয়সসীমা ও আলামত শরী'আতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে। কোনো ছেলে বা মেয়ের মধ্যে বালেগ হওয়ার নির্দিষ্ট আলামত পাওয়া গেলে বা নির্দিষ্ট বয়সসীমায় পৌঁছলেই তাকে বালেগ গণ্য করা হবে এবং তখন থেকেই শরী'আতের হুকুম-আহকাম তার উপর প্রযোজ্য হবে।

ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে শরী'আতে দিয়ত,কিসাস অনুযায়ী শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু মানবরচিত গণতন্ত্রের আইনে কখনো যাবতজীবন কারাদন্ড দেওয়া হয়, কখনো নিরপরাধকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়, কখনো ফাঁসির প্রকৃত আসামি শাস্তিও পায় না, রাষ্ট্রপতির ক্ষমা লাভ করে ছাড়া পেয়ে যায় অনায়াসেই। হত্যার সঠিক বিচারটুকুও এখানে করা সম্ভব ই হয়না। স্বজনহারাদের পরিবার বছরের পর বছর মানুষের নিজস্ব চিন্তাচেতনার তৈরি গণতান্ত্রিক আদালতের চত্বরে ঘুরপাক খেতেই থাকে ন্যায়বিচারের জন্য তবুও ন্যায়বিচারের দেখা মেলে না বরং স্বজনহারারা হয়ে পড়ে মানসিক ও শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত। কেননা মানব রচিত বিচার বিভাগ তো স্বয়ং এখানে পরাধীন, শংকিত থাকে গণতান্ত্রিক দলের নেতার হুমকির কাছে ।যেই বিচার বিভাগ নিজেই পরাধীন, সে কিভাবেই বা ন্যায় বিচার করবে মাজলুমদের সাথে।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,

-حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا«

অনুবাদঃ আবুল ওয়ালীদ (রহঃ) ... আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, উসামা (রাযিঃ) জনৈক মহিলার ব্যাপারে নবী (ﷺ) এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কারণ তারা নিম্নশ্রেনীর লোকদের উপর শরী'আতের শাস্তি কায়েম করতো। আর সম্মানিত লোকদেরকে রেহাই দিয়ে দিত। ঐ মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার জান! ফাতিমাও যদি এ কাজ করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম"। [সহীহ বুখারী, হা/৬৩৩০]

অথচ এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত আদালত ও বিচারকগণ নির্লজ্জতা এবং দুঃসাহসিকতার সাথে আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানব রচিত অসার আইন দ্বারা বিচার কার্য সম্পাদন করে যাচ্ছে এবং এজন্য নিজেদের আযাবের উপযুক্ত মনে করা তো দূরের কথা; বরং নিজেদের অনেক বড় ন্যায়বিচারক দাবি করে। সেইসাথে

কুরআনের আইন (রজম, বেত্রাঘাত, হাত কর্তন, সুদের নিষেধাজ্ঞা) ইত্যাদি বিষয়গুলোর বাস্তবায়নকে শক্তির দ্বারা প্রতিহত করে আসছে। গণহত্যাও যেন এই গণতন্ত্রের কাছে বাঁ হাতের খেল।

যাদের অন্তরে মৃত্যুর পর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করার অনুভূতি এবং চিন্তা নেই, যাদের মধ্যে সুপথ সন্ধানের অথবা ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার কোনই উৎসাহ ও আগ্রহ নেই, তারা সুপথ কোথা থেকে এবং কেনই বা পাবে? সকাল তো তাদের জন্য, যারা ঘুম ছেড়ে চোখের পাতা মেলে জেগে ওঠে।

সূরা ত্বীন, আয়াত নং ৮ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ

অর্থঃ "আল্লাহ বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন"?

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে সূরা নিসা আয়াত নং ১৩৫ এ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَ اِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

অর্থঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও এটি তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয় ; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কেটে যাও তবে তোমরা যা করো আল্লাহ তো তার সম্যক খবর রাখেন"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা ছোয়াদ আয়াত নং ২৬ এ ইরশাদ করেছেন,

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

অর্থঃ “(হে দাউদ), নিশ্চয় আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করো আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল”।

সূরা সাদ আয়াত নং ২০ এ আল্লাহ তা’আলা আরো ইরশাদ করেছেন,

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

অর্থঃ "আর আমি তাঁর [দাউদ (আঃ)] রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা দিয়েছিলাম"।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন চুরির শাস্তি হাত-কাটা সাব্যস্ত করেছেন, ডাকাতির শাস্তি হিসেবে হত্যা / শূলে চড়ানো হবে/ বিপরীত দিক থেকে হাত পা কাটা / দেশ থেকে নির্বাসন নির্ধারণ করেছেন কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এর পরিবর্তে জেল-জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটিই হচ্ছে আল্লাহর বিধান স্পষ্ট পরিবর্তন। যার দরুণ সমাজে অপরাধ বেড়েই চলেছে, দেখা দিয়েছে চরম বিশৃঙ্খলা।

কুরআনুল কারীমে সূরা মায়িদা আয়াত নং ৪৯ ও ৫০ এ আল্লাহ তা’আলা মানুষকে সর্তক করে ইরশাদ করেছেন,

وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ

অর্থঃ “আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা করো, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাকো যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখো যে, আল্লাহ তো কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আযাব দিতে চান। আর মানুষের অনেকেই সত্যত্যাগী।”

اَفَحُكۡمَ الۡجَاهِلِيَّةِ يَبۡغُوۡنَ ؕ وَ مَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكۡمًا لِّقَوۡمٍ يُّوۡقِنُوۡنَ ۔

অর্থঃ “তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর”?

আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্যকারীদের পূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা বাকারা আয়াত নং ২০৮ এ আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا ادۡخُلُوۡا فِى السِّلۡمِ كَآفَّةً ۪ وَ لَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّيۡطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِيۡنٌ

অর্থঃ “হে মু’মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু”।

এখানে আল্লাহ তা’আলা পূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, শয়তানের অনুসরন করো না। এর উদ্দেশ্য হলো, যদি তোমরা পূর্ণরূপে প্রবেশ না করো বরং কিছু বিষয় ছেড়ে দাও তাহলে এটা শয়তানের অনুসরণ হবে। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের কাছে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তো এটাই দাবী করে যে, মুসলিমরা নামায, রোযা, হজ্জ পালন করুক, তবে ব্যবসা-বাণিজ্য, আদালত, সামাজিক লেনদেন, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মানব রচিত গণতন্ত্রের আইন ই অনুসরণ করুক, যাকাত না দিক। কত বড় স্পর্ধা মানব রচিত গণতন্ত্রের! গণতন্ত্র তো সরাসরি পরাক্রমশালী সর্ববিষয়ে পূর্ণক্ষমতাবান মহান আল্লাহর দেওয়া বিধানের সাথে বিদ্রোহ করে বসেছে।')نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ذَالِكَ(ْ

কুরআন ও হাদিস থেকে দলীল সমূহঃ

সুদ সংক্রান্তঃ

কুরআনুল কারীমে সূরা আল বাকারা যথাক্রমে ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯ নং আয়াতে সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থঃ "যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটি এইজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই।' অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই দোজখবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে"।[সূরা বাকারা-২৭৫]

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

অর্থঃ"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না"। [সূরা বাকারা-২৭৬]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِن كُنتُمْ ، لم تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ مُؤْمِنِينَ - فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
رؤوس أموالكم لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون-

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং সুদের যা কিছু পাওনা আছে তার দাবি ছেড়ে দাও। এমন করতে সম্মত না হলে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তওবা করো

তবে তোমাদের মূলধন গ্রহণ করবে। তোমরা কারোর উপর জুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না"। [সূরা বাকারা-২৭৮,২৭৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا، وَفِيْ رِوَايَةٍ: حُوْبًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْـمُسْلِمِ.

অনুবাদঃ "সুদের তিয়াত্তরটি গুনাহ রয়েছে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির নিজ মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করার সমতুল্য গুনাহ্। আর সবচেয়ে বড় সুদ হলো, কোন মুসলিম ব্যক্তির ইজ্জত হনন"।[ইবনু মাজাহ্ ২৩০৪, ২৩০৫; হা'কিম : ২/৩৭ সাহীহুল্ জা'মি', হাদীস ৩৫৩৩]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

পরিচ্ছেদঃ **১৯.** সুদখোর এবং সুদদাতা উভয়ের জন্য অভিশাপ

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ ইবনু সাববাহ, যুহায়র ইবনু হারব ও উসমান ইবনু আবূ শাইবা (রহঃ) জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নাত করেছেন সুদখোরের উপর, সুদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও তার সাক্ষী দু'জনের উপর এবং বলেছেন এরা সবাই সমান। (সহীহ মুসলিম, হা/ ১৫৯৮)

যিনা, যিনার অপবাদ, সমকামিতা, ব্যভিচার সংক্রান্তঃ

সূরা আন নূর- আয়াত নং ২, আয়াত নং ৪ ও আয়াত নং ৫ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّ لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থঃ "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে। তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখ, তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" [সূরা নূর,আয়াত নং-২]

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

অর্থঃ "যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে। অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই সত্যত্যাগী।" [সূরা নূর,আয়াত নং-৪]

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ "কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।[সূরা নূর, আয়াত নং-৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থঃ “যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জের প্রসার কামনা করে নিঃসন্দেহে তাদের জন্য এ পার্থিব জগতে ও পরকালে কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে”।সূরা নূর,আয়াত নং-১৯]

সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৩৫ এ আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন,

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا

অর্থঃ “আর যিনার নিকটবর্তী হইও না। এটি অশ্লীল ও মন্দ পথ”।

সুরা আল-আ‘রাফ: ৮০-৮১ আয়াতে আল্লাহ তা’আলা (সমকামীতা প্রসঙ্গে) ইরশাদ করেছেন,

لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

অর্থঃ "আর আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম। যখন সে তার কওমকে বলেছিল, ‘তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি? তোমরা তো নারীদের ছেড়ে পুরুষদের সাথে কামভাব পূর্ণ করছো। বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী কওম’।"

কওমে লূতের শাস্তি (সূরা আল-হিজর আয়াত নং ৭৩-৭৫)

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ,

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ

অর্থঃ "অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় এক প্রচন্ড আওয়াজ তাদের ধ্বংস করে দিলো। আমি জনপদটিকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের ওপর কঙ্করময় পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ করলাম। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمِ. "

অনুবাদঃ ইয়াইয়া ইবনে ইয়াইয়া তামিমী (রহঃ) ..... উবাদাহ ইবনে সামিত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের জন্য একটি পথ বের করে দিয়েছেন। অবিবাহিত অবিবাহিতার সাথে ব্যভিচার করে একশ বেত্রাঘাত করো এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দাও। আর বিবাহিত বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করলে একশ বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা করবে)। (সহীহ মুসলিম, হা/৪২৬৭)

বিয়ে ও বালেগ হওয়া সংক্রান্তঃ

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন-নূর আয়াত নং ৩২ এ ইরশাদ করেছেন,

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

অর্থঃ "আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী"।

পরিচ্ছেদঃ বালিগ হওয়ার বয়স

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي . قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ . فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ. ِ

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর (রহঃ) ..... ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উহুদ দিবসে (যুদ্ধে) আমাকে (যোদ্ধাদের সারিতে) পর্যবেক্ষণ করলেন তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর। তিনি আমাকে (যুদ্ধের জন্য) অনুমতি দিলেন না। খন্দকের দিন তিনি আমাকে পর্যবেক্ষণ করলেন, তখন আমার বয়স পনের বছর। তিনি আমাকে (যুদ্ধে গমনের) অনুমতি দিলেন। নাফি বলেন, আমি উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে এ হাদীস তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি তখন খলিফা ছিলেন, তিনি বললেন এটাই হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কের সীমারেখা। তিনি তাঁর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিকট এই মর্মে ফরমান পাঠালেন, তারা যেন পনের বছর বয়সের লোকদের (পূর্ণ) ভাতা প্রদান করেন এবং তার নীচের বয়সের যারা, তাদেরকে পরিবারের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যরূপে গণ্য করেন।[সহিহ মুসলিম, বুখারী,হা/৪৬৮৪]

حدثنا محمد بن وزير الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني . قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير . ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة . حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير . وذكر ابن عيينة في حديثه . قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه

حكم الرجال . وقال أحمد وإسحاق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنة ولا احتلامه فالنبات يعني العانة .

অনুবাদঃ ইবনু উমার হতে, তিনি নাফি হতে এই সূত্রেও ইবনু উমর (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের মত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ কথাটুকু এই সূত্রে উল্লেখ নেই, উমার ইবনু আবদুল আযীয (রহঃ) লিখে পাঠালেন, এটাই বালেগ ও নাবালেগের মধ্যকার বয়সসীমা। একথাই ইবনু উআইনা তার হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেনঃ আমি এ হাদীসটিকে উমার ইবনু আবদুল আযীযের সামনে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এটাই হচ্ছে নাবালেগ ও সৈনিকের মধ্যে বয়সসীমা।এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। এরকম মতই সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (রহঃ) এর। তাদের মতে, নাবালেগ সন্তান পনের বছরে পৌছার সাথে সাথে বালেগদের মধ্যে গণ্য হবে। পনের বছরের পূর্বেই যদি স্বপ্নদোষ হয় তবে সে বালেগ বলে গণ্য হবে। আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, বালেগ হওয়ার জন্য তিনটি বিকল্প নিদর্শন রয়েছে, পনের বছর বয়স হওয়া; ইহতিলাম (বীর্যপাত) হওয়া; যদি এরকম হয় যে, বয়সও অনুমান করা যাচ্ছে না আবার ইহতিলামও হয় না এক্ষেত্রে লজ্জাস্থানে লোম গজানোকে ধরে নিতে হবে। [হাদিসটি সহিহ]

মদ, জুয়া সংক্রান্তঃ

সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত নং ৯০ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থঃ "হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো-যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো"।

মদের লেনদেন হারাম হওয়ার ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন;

قَالَ رَسُوْلُ الله إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

অনুবাদঃ "নিঃসন্দেহে যিনি (আল্লাহ তা'আলা) মদ পানকে হারাম করেছেন, তিনি মদ বিক্রিকেও হারাম করেছেন।"(সহীহ মুসলিম)

-حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «[ص:] ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ»

অনুবাদঃ হাফস ইবনে উমর ও আদম ইবনে আবু ইয়াস (রহঃ) ..... আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত এবং জুতা মেরেছেন। আর আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।(সহীহ বুখারি, হা/৬৩১৬)

চুরি সংক্রান্তঃ

সূরা আল-মায়িদার আয়াত নং ৩৮ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"

অর্থঃ "পুরুষ চোর ও নারী চোর— তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

অনুবাদঃ ইয়াইয়া ইবনে ইয়াইয়া, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও ইবনে আবূ উমর (রহঃ) ..... আয়িশা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক দীনারের এক চতুর্থাংশ এবং এর অধিক পরিমাণ মূল্যের মাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তন করতেন।(সহীহ মুসলিম,হা/৪২৫১)

কিসাস

আল কুরআনে সূরা আল বাকারা আয়াত নং ১৭৮ ও আয়াত নং ১৭৯ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

অর্থঃ "হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব"।[সূরা বাকারা- ১৭৮]

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَأُولِي الْأَلْبَابِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থঃ “এবং হে বুদ্ধিমানেরা! কিসাসের ভেতর তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন (রক্ষার ব্যবস্থা)। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।" [সূরা বাকারা-১৭৯]

সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৪৫ এ আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থঃ "এবং আমি তাতে (তাওরাতে) তাদের জন্য বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান ও দাঁতের বদলে দাঁত। আর জখমেও (অনুরূপ) বদলা নেওয়া হবে। অবশ্য যে ব্যক্তি তা (অর্থাৎ বদল) ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা (গুনাহের) কাফফারা হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারা জালিম।"

সূরা নিসা আয়াত নং ৯৩ এ আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا

অর্থঃ “আর যে ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা‘নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন”।

সূরা আন নাহল আয়াত নং-১২৬ এ আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন,

وَ اِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُوۡا بِمِثۡلِ مَا عُوۡقِبۡتُمۡ بِهٖ ؕ وَ لَئِنۡ صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٌ لِّلصّٰبِرِيۡنَ

অর্থঃ “যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য সেটি তো উত্তম”।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، وَهُوَ ابْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ " . وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيب. ۞

অনুবাদঃ আহমাদ ইবনে সাঈদ দারিমী (রহঃ) ..... আমর ইবনে শুআয়ব তৎপিতা তার পিতামহ (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর) (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কাউকে হত্যা করবে তাকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাওয়ালা করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারবে আর ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করতে পারবে। দিয়াত হল, ত্রিশটি পূর্ণ তিন বছর বয়সের উট (হিককা), ত্রিশটি পূর্ণ চার বছর বয়সের উট (জাযআ) এবং গর্ভবতী উট (খালিফা)। আর যার উপর তারা পরস্পর সমঝোতা করে নেয় তাতে তাদের অধিকার রয়েছে। দিয়াতের কঠোরতার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত অবস্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। [ইবনে মাজাহ ২৬২৬]

ডাকাতি সংক্রান্তঃ

ডাকাতির শাস্তি সম্পর্কে সূরা আল মায়িদা আয়াত নং ৩৩ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيۡنَ يُحَارِبُوۡنَ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ وَ يَسۡعَوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ فَسَادًا اَنۡ يُّقَتَّلُوۡۤا اَوۡ يُصَلَّبُوۡۤا اَوۡ تُقَطَّعَ اَيۡدِيۡهِمۡ وَ اَرۡجُلُهُمۡ مِّنۡ خِلَافٍ اَوۡ يُنۡفَوۡا مِنَ الۡاَرۡضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡىٌ فِى الدُّنۡيَا وَ لَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ۞

অর্থঃ "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাআযাব"।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে কেউ ইসলামের শৃঙ্গে হাতিয়ার ব্যবহার করবে, যাতায়াতকে ভীতিপ্রদ করে দিবে, (ডাকাতি রাহাজানি করবে) তারপর যদি তাদেরকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়, তবে মুসলিম শাসকের এ ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবেন, নতুবা শুলে চড়াবেন, অথবা তার হাত-পা কেটে দিবেন। [তাবারী]

একনজরে গণতন্ত্র ও ইসলামের মৌলিক দ্বন্দ্বসমূহঃ

গণতন্ত্র	ইসলাম
সার্বভৌমত্বঃ জনগণ	সার্বভৌমত্বঃ আল্লাহ [সূরা বাকারা-১০৭, সূরা মুলক-০১]
ধর্ম ও রাষ্ট্রঃ ধর্মনিরপেক্ষ	ধর্ম ও রাষ্ট্রঃ দ্বীন ইসলাম।রাষ্ট্র চলবে শরীয়ত দিয়ে।[সূরা আল ইমরান-১৯]
সংবিধানঃ মানব রচিত ও পরিবর্তনযোগ্য	সংবিধানঃ আল্লাহ প্রদত্ত ও অপরিবর্তনীয় [সূরা ইউনুস-৬৪]
আইনের উৎসঃ সংসদ, সংবিধান ও সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়।	আইনের উৎসঃ কুরআন, সুন্নাহ,ইজমা,কিয়াস।[সূরা নিসা-৫৯, সূরা আহযাব-৩৬]
শাসকের বৈধতাঃ ভোটে নির্বাচিত হলে যে কেউ বৈধ।মুসলিম হওয়া জরুরি না।নারীও হতে পারে শাসক।	শাসকের বৈধতাঃ মুসলিম ও পুরুষ হতে হবে।[সূরা নিসা-৩৪, সুনানে তিরমিযী-২২৬২, ফিকহুস সুনান-১৯৬২, আলমুফহিম, কিতাবুল ইমারাহ,খন্ড-৪ পৃষ্ঠা ৩৯, দারু ইবনে কাসির।]
সংখ্যাগরিষ্ঠতাঃ সত্যের মানদন্ড	সংখ্যাগরিষ্ঠতাঃ সত্যের মানদন্ড নয় [সূরা আনআম-৩৭, ১১৬, সূরা বাকারা-১৩]
হালাল, হারামঃ ভোটে বদলায়। যেমনঃ সুদ, মদ, যিনা, সমকামিতা হালাল করা হয়েছে,	হালাল, হারামঃ আল্লাহ যা হালাল করেছে তা হালাল, যা হারাম করেছে তা

১৮ বছরের কমে বিয়েকে অবৈধ করেছে।	হারাম।এটি বদলানোর অধিকার কারো নেই। [হা মীম সিজদাহ-৪২]
অর্থনীতিঃ সুদভিত্তিক ব্যাংকিং	অর্থনীতিঃ হালাল যেকোনো কিছু ।
আনুগত্যের সীমাঃ রাষ্ট্রের আইন মানতেই হবে, যদি তা আল্লাহর হুকুমের খেলাপ ও হয়।	আনুগত্যের সীমাঃ আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই। আনুগত্য হবে কেবল ভালো কাজে। [সহিহ মুসলিম -১৮৪০, বুখারী শরীফ-৭১৪৫, মিশকাত-৩৬৯৬]

গণতন্ত্রকে ইসলামীকরণ বা ইসলামসিদ্ধ করা কি সম্ভব?

উম্মাহর মাঝে সুচতুরভাবে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মতবাদ ঢুকিয়ে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রয়াস অনেক আগে থেকেই চলমান। ফলে একদিকে যেমন ইসলামের বিধি-বিধানের উদ্ভট ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতা শুরু হয়েছে, অপরদিকে তেমনি ইসলামের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক চিন্তা-দর্শনকেও ইসলামাইজেশনের/ ইসলামসিদ্ধের মহামারী দেখা দিয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর এই দুটি পরিভাষার সঙ্গা ও গণতন্ত্রের অপরিহার্য বিষয় থেকে সহজেই বুঝতে পারা সম্ভব। সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নরূপঃ

ইসলামীকরণ (Islamization):

একটি বিস্তৃত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ইসলামী নীতি, বিশ্বাস এবং অনুশীলনসমূহ কোনো সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা শিক্ষা কাঠামোর সাথে একীভূত করা হয়।

ইসলামসিদ্ধ করা (Validation):

সাধারণত কোনো বিষয়, কাজ বা পদ্ধতিকে ইসলামের মূল নীতি ও বিধানের (কুরআন ও সুন্নাহর) আলোকে বৈধ বা গ্রহণযোগ্য করে তোলাকে বোঝায়। সংক্ষেপে, কোনো

কিছুকে ইসলামসম্মত বা ইসলামের বিধান অনুযায়ী সঠিক বলে প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠা করাই হলো 'ইসলামসিদ্ধ করা'।

আর গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন এবং গণতন্ত্রে অপরিহার্য বিষয় হলো, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কেবল জনগণ হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মতই একমাত্র ধর্তব্য, শাসন ক্ষমতা মানুষের হাতে ন্যস্ত। পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কোনো মানুষ হতে পারে না; বরং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্যের মানদন্ড নয়, আইন প্রণয়নের অধিকার কেবল আল্লাহ তা'আলার। ইসলাম গণতন্ত্রকে তাই সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। যার কারণে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিদ্যমান গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কোনোদিনও সমুন্নত হতে পারে না। এর দ্বারা না গণতন্ত্রকে ইসলামসিদ্ধ করা যেতে পারে, আর না খেলাফত ও ইসলামী শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রচলিত নীতিগুলো ঢুকিয়ে তার সরল ও সহজ কার্যপদ্ধতিকে শুধুশুধুই জটিল ও দুর্বোধ্য করা যেতে পারে। গণতন্ত্র তো একটি ধর্মহীন ব্যবস্থা, আর এর পতাকাবাহীরা ছিল ধর্মবিমুখ। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফতের ভিত্তিই হলো আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পরকালের বিশ্বাস। আর যারা একে ধারণ করেছিলেন, তারা ছিলেন খুবই পরহেজগার ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী মানুষ।

অন্ধকার-আলোর মধ্যে যেমন কোনো মিলন ও সমঝোতা আশা করা যায় না, ঠিক তেমনি ধর্ম ও ধর্মহীনতা এবং খিলাফত ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো সমঝোতা ও মিলনেরও আশা করা যায় না। এটি এমন এক মরীচিকা যাকে পানি মনে করে পিপাসার্ত ব্যক্তি তার পিছনে পিছনে চলতে থাকে কিন্তু পানি থাকলে না সে পাবে?

সূরা আন নুর আয়াত নং ৩৯ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَٰلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْـَٔانُ مَاءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَوَجَدَ قلے اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

অর্থঃ "আর যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকার মত, পিপাসিত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার কাছে আসবে, তখন সে দেখবে

সেটা কিছুই নয়। আর সে সেখানে আল্লাহকে দেখতে পাবে। অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পরিপূর্ণ করে দিবেন। আর আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী"।

গণতন্ত্র এমন এক অন্ধকার; ভুল চালক যাতে প্রবেশের পর মানুষ শুধু গন্তব্যস্থল নয়; বরং রাস্তাও ভুলে যায়। এই তন্ত্রে ইসলাম তালাশ করা সময় অপচয় ছাড়া কিছুই না। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদকে মাঝে মাঝে বলতে শোনা যায় যে, গণতন্ত্রের ভালো দিকগুলো ইসলামেও আছে যেমন: পরামর্শ, জবাবদিহিতা, জুলুমের প্রতিরোধ, আইনের চোখে সবাই সমান ইত্যাদি। পরামর্শ প্রসঙ্গে কেউ কেউ এটিও বলে থাকেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় পরামর্শ ও বাইআতের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন হতো। এটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কাছাকাছি। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই তন্ত্রে মন্ত্রে ইসলামের সামান্যতম চিহ্ন নেই। যদি অনু পরিমাণও ইসলাম থাকতো তাহলে ইসলামের ঘোর শত্রু কখনোই গণতন্ত্রের নামও নিত না। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গণতন্ত্রে ইসলামের সামান্যতম চিহ্ন নেই। তাই এটিকে ইসলামী কাঠামোয় খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা বা ইসলামিক গণতন্ত্র নামকরণ দেওয়ার চেষ্টা করাটি বোকামি তেমনই, যেমন বোকামি হলো তথাকথিত নারী পুরুষের মাঝে বিবাহ বহির্ভূত হারাম সম্পর্ককে “হালাল ভালোবাসা বা পবিত্র ভালোবাসা” নামকরণের মাধ্যমে সমাজে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করা।

মুফতি তাকী উসমানী হাফিজাহুল্লাহ.” ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত” পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭ এ লিখেন,

مغربی جمہوریت کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ عوام کو حاصل ہے، اور عوام کی اکثریت جس چیز کو چاہے قانون بناسکتی ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے صریح خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نظریہ اسلام کے بنیادی عقیدہ "ان الحکم الا للہ" سے صریح متصادم ہے۔ اس لیے جمہوریت کو اسلامی کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شراب کو اسلامی شراب کہے۔

অনুবাদঃ "পশ্চিমা গণতন্ত্রের মূল দর্শন হলো, সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হাতে। এবং জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যা চায় তাকে আইন বানাতে পারে, যদিও সেটা আল্লাহ তা’আলার বিধানের স্পষ্ট বিরোধী হয়। এই মতবাদ ইসলামের মৌলিক আকিদা 'হুকুম

দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ' [সূরা ইউসুফ: ৪০] এর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। তাই গণতন্ত্রকে ইসলামী বলা তেমনই, যেমন কেউ মদকে ইসলামী মদ বলে।"

তাই, কেউ যদি যেকোনো ভাবে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করতে চায় এবং এর বৈধতা দিতে চায় তাকে তা শুধুমাত্র তাওহীদ ও রিসালাত অস্বীকার করার পরেই তবে গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ফুরক্বন আয়াত নং ২৩ এ ইরশাদ করেছেন,
وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا

অর্থঃ "আর তারা যে কাজ করেছে আমি সেদিকে অগ্রসর হবো। অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দিবো"।

ইবনে কাসীর (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,
"যে আমলে ইখলাস (আন্তরিকতা) থাকবে না এবং আল্লাহর শরী'আত অনুযায়ী যে আমল হবে না তা বাতিল ও বিফল হয়ে যাবে"।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوعًا: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

অনুবাদঃ আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করবে যা আমাদের কর্ম নয় তা প্রত্যাখ্যাত হবে ।[সহিহ মুসলিম,হা/৩০]

আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারা আয়াত নং ২৬৯ এ ইরশাদ করেছেন,

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ-

অর্থঃ "বুদ্ধিমান লোক ব্যতীত কেউই নসীহত গ্রহণ করে না"।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটের মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা: একটি পর্যালোচনা

আল্লাহর দেওয়া নির্ধারিত পথ খেলাফত প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানুষের গড়া মতবাদ গণতন্ত্র দিয়ে কস্মিনকালেও ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে না। তবে কিছুটা কল্যাণধর্মী কাজ করা যেতে পারে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠা কেবল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চিরতরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই সম্ভব হবে। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মারপ্যাঁচে থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে রাজনীতি করে ইসলামকে কলুষিত করার দরকার নেই, মুসলমানদের কাছে ইসলামকে শত্রু বানিয়ে লাভ নেই, কেননা যেই রাষ্ট্রে অধিকাংশ মুসলিমদের বসবাস সেখানে সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়েই মুসলিমই হয়ে থাকে। এভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বদলে ইসলামের ক্ষতি হয়। কেননা মানব রচিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার আসনে বসতে হলে ছায়া রাষ্ট্রের আস্থা অর্জন করতে হয়, নানা মিথ্যা আশ্বাস ,ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়। আর এই ছায়া রাষ্ট্রের আস্থা অর্জন করতে হলে মুনাফেকি করতেই হবে, তাদের দাসত্ব বরণ করতেই হবে। এটি করা ছাড়া প্রচলিত গণতান্ত্রিক সিস্টেমে জয় লাভ করা অসম্ভব এবং ক্ষমতার মসনদে বসাও অসম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা সূরা মুহাম্মাদ আয়াত নং ২৫ এ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرۡتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَٰرِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡهُدَى ٱلشَّيۡطَٰنُ سَوَّلَ لَهُمۡ وَأَمۡلَىٰ لَهُمۡ

অর্থঃ "নিশ্চয় যারা হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পৃষ্টপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান তাদের কাজকে চমৎকৃত করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে"।

কুরআনুল কারীমে সূরা নিসা, আয়াত নং-১৩৮, ১৪২ ও ১৪৫ এ আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

অর্থঃ "মুনাফিকদের সুসংবাদ দিন যে, নিশ্চয় তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব"।[আয়াত নং-১৩৮]

نَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَ اِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থঃ "নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে"। [আয়াত নং-১৪২]

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

অর্থঃ "নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তুমি কখনও তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না"। [সূরা নিসা, আয়াত নং-১৪৫]

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ اعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَ اَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থঃ "কিন্তু যারা তাওবা করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে, তারা মুমিনদের সঙ্গে থাকবে এবং মুমিনদেরকে আল্লাহ অবশ্যই মহাপুরস্কার দিবেন"। [আয়াত নং-১৪৬]

গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার বিশ্বাস হলো ধর্ম ব্যক্তি জীবনে এবং ইবাদাত খানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষের নিজস্ব মতামত দিয়ে পরিচালিত হবে। এই মানব রচিত জীবনব্যবস্থায় একজন আলেমের সত্যিকার অর্থে কতটুকু মর্যাদা আছে তা বোধসম্পন্ন মানুষের কাছে অজানা নয়। এমনকি জুম'আর নামাজে খতিব সাহেবেরা স্বাধীনভাবে খুতবাও দিতে পারেনা। পক্ষান্তরে ইসলামে ধর্ম নিরপেক্ষতার কোনো জায়গা নেই, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আকীদা হলো মানুষের জন্য আল্লাহ

তা'আলা জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। জীবন এবং রাষ্ট্র সকল কিছু সে ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হবে। আল্লাহর হুকুম কেবলমাত্র ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। ইসলামের লক্ষ্য আত্মিক,পরকাল এবং পার্থিব উন্নতি। আর গণতন্ত্রের লক্ষ্য শুধু ক্ষমতার রাজনীতি। যেখানে ছড়ি ঘোরায় সংখ্যালঘু শাসকশ্রেনী, যারা শুধু শাসিত গোষ্ঠীর দেহের ওপরই রাজত্ব করে না; বরং তাদের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শকেও গণতন্ত্রের গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলে। শাসিত জনসাধারণকে শুধু বক্তৃতা-শ্লোগান, প্রতিশ্রুতি ও কল্পনার বেড়াজালে আটকে রাখে। পক্ষান্তরে ইসলামের শিক্ষা নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, যা মানুষকে দেয় গোলামির জিন্জির থেকে চিরতরে মুক্তি। আর গণতন্ত্রের শিক্ষা ব্যক্তিস্বার্থ ভোগবাদ। এসব তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের উম্মাত হয়ে নিজেই নিজেকে একবার প্রশ্ন করুন তো যে, আদৌ কি সম্ভব এসব তন্ত্র মন্ত্রের ব্যবস্থায় থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় থেকে অনেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এটি বলে থাকেন যে, "গণতন্ত্রের মাঝে থেকেও তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে থাকে" এবং আল্লাহ কে সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। এটা কিভাবে সম্ভব যে হারামকে হারাম মনে করবে, অতঃপর সেই সংবিধান ও আইন কানুনকে পবিত্র মনে করবে যেখানে অগণিত হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করা হয়েছে, যেটির জন্ম ই হয়েছে জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃত প্রদান দ্বারা? সেই সংবিধান রক্ষার জন্য অঙ্গীকার করা হবে? তা অনুসরণ করার প্রতি লোকদের আহবান করবে? তার সাথে বিদ্রোহ ও সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করবেন না, এটা কি আল্লাহর বিধানের সাথে ঠাট্টা নয়? উম্মাহ ভুলে যাচ্ছে – মুসলিম সমাধান খুঁজবে কুরআন, সুন্নাহর মাঝে, কোন তাগুত বা ব্যক্তি মতবাদে নয়।

কুরআনুল কারীমে সূরা নিসা, আয়াত নং ৬০ ও ১৪০ নং এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ يَزۡعُمُوۡنَ اَنَّهُمۡ اٰمَنُوۡا بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ يُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ يَّتَحَاكَمُوۡۤا اِلَى الطَّاغُوۡتِ وَ قَدۡ اُمِرُوۡۤا اَنۡ يَّكۡفُرُوۡا بِهٖ ؕ وَ يُرِيۡدُ الشَّيۡطٰنُ اَنۡ يُّضِلَّهُمۡ ضَلٰلًا بَعِيۡدًا

অর্থঃ "আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়"। (সূরা নিসা-৬০)

وَ قَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِى الۡكِتٰبِ اَنۡ اِذَا سَمِعۡتُمۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكۡفَرُ بِهَا وَ يُسۡتَهۡزَاُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُوۡا مَعَهُمۡ حَتّٰى يَخُوۡضُوۡا فِىۡ حَدِيۡثٍ غَيۡرِهٖۤ ۚ اِنَّكُمۡ اِذًا مِّثۡلُهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الۡمُنٰفِقِيۡنَ وَ الۡكٰفِرِيۡنَ فِىۡ جَهَنَّمَ جَمِيۡعًا

অর্থঃ "কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসো না, নয়তো তোমরাও তাদের মত হবে। মুনাফিক এবং কাফের সবাইকে আল্লাহ তো জাহান্নামে একত্র করবেন"। (সূরা নিসা-১৪০)

আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহল, আয়াত নং -৩৬ এ আরো ইরশাদ করেছেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থঃ "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে এই বাণী সহকারে রাসূল পাঠিয়েছি যেন তোমরা আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।"

সুতরাং যে আল্লাহর অনুগত হবে তাঁর অহী অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়ে ফায়সালা করবে সে আল্লাহর বান্দা ও গোলাম। আর যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অনুগত হবে এবং অন্য কোন বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে সে হবে তাগুতের গোলাম।

ইমাম তবারী (রহ.) তাগুতের সংজ্ঞায় বলেন-

والصواب من القول عندي في الطاغوت"، أنه كل ذي طغيان على الله قعيد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود، أو شيطانا، أو وثنا، أو صنما، أو كائنا ما كان من شيء.

“আমার মতে তাগুতের সঠিক সংজ্ঞা হলো: সেই হলো তাগুত যে আল্লাহ তা’আলার অবাধ্য হয়। ফলে আল্লাহ তা’আলাকে ব্যতিরেকে তারই উপসনা করা হয়, হয়ত তার পক্ষ থেকে উপাসনাকারীকে বাধ্য করার কারণে অথবা উপসনাকারীর তার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে। সেই উপাস্য হতে পারে মানুষ অথবা শয়তান, মূর্তি অথবা ভিন্ন কোন পূজনীয় বস্তু বা অন্য যে কোন বস্তু”। [তাফসীরে তবারী, খণ্ডঃ৩, পৃষ্ঠা: ২১)

এছাড়া এ বিষয়টিও উপলব্ধিতে আনা প্রয়োজন যে, ভোটে নির্বাচিত হয়ে যদি কোন সংসদে শতভাগ দ্বীনদার এবং শরী’আত অনুসারী লোকেরা বসে থাকে তারপরেও আল্লাহর শরী’আতকে তখন পর্যন্ত সংবিধানের অংশ বানানো যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সংসদে তা মঞ্জুর না করা হয়। সংসদের সদস্যরা নিজেদের খায়েশ অনুযায়ী যা চায় তাকেই আইন এবং সংবিধানে স্থান দেয়। সুতরাং অনৈসলামিক পন্থায় ইসলাম কিভাবে আসতে পারে!

এক শ্রেণীর ইসলামী রাজনীতিবিদদের বলতে শোনা যায় যে- "ইসলামেও গণতন্ত্র আছে।” নিতান্ত নির্বোধের মতোই তারা এ কথাগুলো বলেন।

সূরা মুহাম্মাদ আয়াত নং-২৪ এ আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন,

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

অর্থঃ “তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না, নাকি তাদের অন্তরগুলো তালাবদ্ধ?”

একমাত্র ইসলামী শরী'আতের বিধান সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞান না থাকার ফলেই এমন কথাবার্তা তাদের মুখ থেকে বের হয়।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসা, আয়াত নং ৫০ এ ইরশাদ করেন,

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا

অর্থঃ "(আপনি) লক্ষ করুন। তারা কীভাবে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে, (তাদের এ কান্ড) প্রকাশ্য পাপের জন্য যথেষ্ট।"

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِىْنَ

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর কাছ হতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে"? [সূরা আনকাবুত, আয়াত নং ৬৮]

সূরা নিসা আয়াত নং ৫৯ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

অর্থঃ "আর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করো, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে নিয়ে যাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাকো। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর/উৎকৃষ্টতর।"

প্রত্যেক মুসলমান যদি তাদের উপর শরী'আতের আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে পারতো, তবে তা সম্পাদনের বেলায় তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকতো না। বরং শরী'আতের খিদমত ও তার বিধানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতো।

এজন্য প্রয়োজন এক মুসলমান অপর মুসলমানদের শরী'আতের বিধান পরিষ্কাররূপে জানিয়ে দেওয়া এবং শরী'আতের যে দিকটি তাদের কাছে অস্পষ্ট সে দিকটিকে তাদের নিকট প্রকাশ্যরূপে তুলে ধরাই সর্বোত্তম খেদমত বলে বিবেচিত হতে পারে।

গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত ব্যবস্থা। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান নয় এবং এর সাথে ইসলামের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম কখনোই জাহেলিয়াতের সাথে সহাবস্থান করতে পারে না, কিংবা অর্ধেক ইসলাম আর অর্ধেক জাহেলিয়াত মেনে নিতে পারে না। হয় আল্লাহর আইন পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে অথবা মানব-রচিত জীবন-ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামের সংগ্রাম চলতে থাকবে। মুসলমানরা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না কিংবা অন্য কোন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য কাজ করতে পারবে না কিংবা অন্য কোন ব্যবস্থার দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করতেও পারবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য একমাত্র ইসলামী ব্যবস্থাই মনোনীত করেছেন। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল কিছুই বাতিল। তাহলে ইসলাম কায়েমের নামে অন্য ব্যবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করাকে কিভাবে বৈধতা দেওয়া যাবে?

আল্লাহ তা'আলা সূরা হা-মীম-সিজদাহ আয়াত নং ৪২ এ ইরশাদ করেছেন,

لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٌ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ

অর্থঃ "বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসা আয়াত নং ১১৫ এ আরো ইরশাদ করেছেন,

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا

অর্থঃ "আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং বিশ্বাসীদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই

ফিরিয়ে দিব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা কত মন্দ আবাস"!

হারিছ আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন;

وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُنَا جَهَنَّمَ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ " .[هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ]

অনুবাদঃ"আর যে লোক জাহিলিয়াত আমলের রীতি-নীতির দিকে আহবান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল(ﷺ)! সে নামায আদায় করলেও, রোযা রাখলেও? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, সে নামায-রোযা করলেও"।[সুনানে আত তিরমিজী হা/২৮৬৩, মুসনাদে আহমাদ,হা/১৭১৭০,সহীহুল জামি, ১৭২৪]

কেউ যদি গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে এ কথা বলে যে, আইন প্রণয়ন কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে তাহলে এটি হবে শুধু মুখের বুলি মাত্র কেননা গণতন্ত্র কোন প্রকারের ওহীর আনুগত্যকে গ্রহণ করে না। এর স্পষ্ট প্রমাণ হল সংসদে শরী'আত পরিপন্থী আইন প্রণয়ন। ভোটে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকের পক্ষে ইসলামের আইন পরিহার করে কুফরী আইন গ্রহণ খুবই সহজ। কিন্তু কুফরী আইনকে পরিহার করে ইসলামী আইন গ্রহণ করা তত সহজ নয় বরং খুবই কঠিন ব্যাপার, কারণ একদিকে আছে ক্ষমতার লিপ্সা অপরদিকে আছে ক্ষমতা হারানোর ভয়।

সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা যে বস্তুর বৈধতা দিবে তা বৈধ, যদিও তা শরী'আত কর্তৃক নিষিদ্ধ সুদ, যিনা, মদের মতো অভিশপ্ত বস্তুই হোক না কেন? অথবা আল্লাহ তা'আলার দন্ডবিধিই হোক না কেন, যা রহিত করা তো দূরের কথা এতে সামান্য পরিবর্তন করারও অবকাশ নেই। অনুরূপভাবে সংসদ যা অবৈধ বলবে তা অবৈধ, যদিও তা

জিহাদের মতো মহান ইবাদত হোক না কেন। এরূপ সংসদের বানানো সংবিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাকে পবিত্র জ্ঞান করা, তার অনুসরণ করা প্রত্যেক সংসদ সদস্যের ওপর ফরজ। একে অবৈধ জ্ঞানকারী সংবিধানের বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে। এখন যদি কেউ এই সংবিধান ছেড়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবিধান অনুযায়ী বিচার মীমাংসা করে অথবা করানোর চেষ্টা করে তাহলে সে গণতন্ত্রের রিটকে চ্যালেঞ্জকারী বলে গণ্য হবে। সরকার তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে পদাতিক বাহিনী থেকে শুরু করে বিমান বাহিনী পর্যন্ত ব্যবহার করাকে বৈধ বলে মনে করে। এরকম বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাদের প্রাণ নাশ করা, তাদের অর্থ-সম্পদ লুট করা এবং এর জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেওয়া তাদের জন্য ফরজ হয়ে যায়। এ কারণেই তাদের মুখ থেকে একথা প্রায় শোনা যায় যে, আমরা সংবিধানের আওতায় থেকে ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব। অথচ সংবিধানের সীমানা সেটিই যা গণতন্ত্র নির্ধারণ করেছে।

গণতন্ত্রে থেকে কিভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হতে পারে যেখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত শরী'আতকে সংসদের অনুমোদনের দ্বারস্ত করে দেয়। সেটি যদি অনুমোদিত হয় তাহলেই কেবল তা রাষ্ট্রীয় আইনের অংশ হতে পারবে নতুবা নয় (নাউযুবিল্লাহ!)। কি আশ্চর্য! মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হয়েও কি এতটাই নির্বোধ হয়ে গিয়েছে যে, এই গভীর উপলব্ধি টুকুও নিজে থেকে করতে পারছেনা। এই সত্যটুকুও বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করে নিতে পারছেনা!

অথচ আল্লাহ পাক সূরা আলে ইমরান: ১৪৯ ও ১৫০ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন:

با روتاه ١٨ و كفروا يردوكم على اعقابكم يايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَهُوَ خَيْرٌ النَّاصِرِينَ - فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللهُ مَوْلَاكُمْ يد و درور بده

অর্থঃ"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফিরদের আনুগত্য করলে তারা তোমাদেরকে ইসলামের পথ থেকে ফিরিয়ে নিবে। অতঃপর তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। বরং আল্লাহই তোমাদের বন্ধু এবং তিনিই তোমাদের উত্তম সাহায্যকারী"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদা,আয়াত নং-৪৮ এ আরো ইরশাদ করেছেন,

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ

অর্থঃ"আর আমি সত্য বিধানসহ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক। কাজেই মানুষদের মধ্যে বিচার ফায়সালা করো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে, আর তোমার কাছে যে সত্যবিধান এসেছে তা ছেড়ে দিয়ে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না"।

সমাজের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক প্রচলিত রাজনৈতিক ধারার সাথে আপোষ করে ইসলাম কায়েম করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা এবং তা বাস্তবায়ন করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। আবার বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও একটি জীবন-ব্যবস্থা, সেটিও বাস্তবায়ন করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। একটি জীবন-ব্যবস্থার পদ্ধতি দ্বারা পৃথিবীতে কখনো আর একটি জীবন-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে এটি কোন দিন হয়নি। যারা বর্তমান ব্যবস্থা অপসারণ করে ইসলামী ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করতে চায়, তারা যদি এ ব্যবস্থার মধ্যেই ঢুকে পড়ে, তাহলে তা অপসারণ করবে কিভাবে? মূলতঃ এর দ্বারা তারা অনৈসলামী ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনছে। আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের উম্মত হয়ে এ কেমন আনুগত্য ? এ কেমন মহব্বত তাদের প্রতি? হারামকে নিজেদের সুবিধা মতো হালাল করে চালিয়ে দিচ্ছে। আরো সহজ ভাবে বলা যায়, যে গাছ উপড়ে ফেলতে চায় , তারা যদি সে গাছের ডালে উঠে বসে থাকেন, তাহলে গাছটি আদৌ উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে কী? তাই এটি পরিষ্কার যে, অনৈসলামী ব্যবস্থার সাথে আপোস করে কাজ করা দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে কোন আপোষ কিংবা কুফর ব্যবস্থার সাথে কখনোই মিলেমিশে কাজ করেন নি।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীন ব্যতীত অন্য কোনো কিছু গৃহীত হবে না। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ [ال عمران৮৫ :

অর্থঃ "যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে" *(আলে ইমরান ৮৫)*।

আবার অনেকে মনে করেন যে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে দ্বীন কায়েমের কাজ করতে হবে। একবারে ইসলাম কায়েম করা খুব দূরহ ব্যাপার এবং হুকুম-আহকামগুলোর বাস্তবায়ন করাও সম্ভব নয় । তার চেয়ে যতটুকু পারা যায় আস্তে আস্তে ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করতে হবে । কিন্তু তারা এটা ভুলে গিয়েছে যে,ক্রমান্বয়ে ইসলাম প্রয়োগ করার মানে হচ্ছে, সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটানো, যা কুরআনে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারা অনেক সময় যুক্তি হিসেবে বলেন যে "পবিত্র কুরআনও পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে"। উপরোক্ত যুক্তি কখনোই শরী'আত সম্মত নয়। যারা মনে করেন যে, ইসলাম এখন একসাথে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, তারা নিজের অজান্তেই এটা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, "ইসলাম বর্তমান সময়ে একটি অবাস্তব দ্বীন, যা একসাথে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।" -নাউযুবিল্লাহ। প্রথমতই এরকম ধারণা আক্বীদাগত দিক থেকে ঠিক নয়।

যারা বলেন যে, কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে, তাদের বুঝতে হবে যে কুরআনের আয়াতসমূহ কোন অবস্থা বা সমস্যার প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান হিসেবে নাযিল হয়েছে এবং কুরআনের কোন আয়াত যখন নাযিল হয়েছিল তখন সাথে সাথে পুরোপুরি পালন করা হয়েছে। নাযিল হওয়ার পর পর্যায়ক্রমিকভাবে পালন করার কোন সুযোগ ছিল না। জিহাদের আয়াত এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম সাথে সাথে মুজাহিদ হয়ে গিয়েছিলেন। চোখের পর্দার আয়াত এসেছে, পর্দা করা শুরু করে দিয়েছিলেন। তাকওয়ার আয়াত এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম মুত্তাকী হয়ে গিয়েছিলেন। হিজরতের আয়াত এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম কালবিলম্ব না করে সাথে সাথে হিজরতের পথে ধাবিত হয়েছিলেন। নারীর পর্দার আয়াত এসেছে, নারী সাহাবীরা সাথে সাথে পরিপূর্ণ পর্দা করে শুরু করেছিলেন। একদম কোরআনিক মুসলমান ছিলেন তারা, কুরআনের বাস্তব প্রয়োগ তো এটিকেই বলে। সুবহানাল্লহ!

আল্লাহর আইনের দিকে একেবারে প্রত্যাবর্তন না করলে কিয়ামত দিবসে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা ত্বহা আয়াত নং ১২৪-১২৬ এ বলেছেন:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا .قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى

অর্থঃ"আর যে ব্যক্তি আমার যিকর (নাযিলকৃত হুকুম আহকাম) হতে বিমুখ হবে তার জন্য দুনিয়ায় হবে সংকীর্ণ জীবন। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাবো। সে বলবে " হে আমার রব, কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালেন? অথচ আমি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিলাম"। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, "হ্যাঁ এমনি ভাবে তো আমার আয়াতগুলো তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। ঠিক সে রকম আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হলো”।

আজ মানবতা নিজের রাস্তাই ভুলে গেছে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক রাস্তায় আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না খেলাফতের আলো দ্বারা নিজেদের পথকে আলোকিত করে নিবে। বর্তমানে মানুষকে যদি কেউ অন্ধকার, গোমরাহী থেকে বের করতে পারে তাহলে তা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাই পারে। আর তা হলো খেলাফত ব্যবস্থা। বাকি সবকিছু ধোঁকা, মিথ্যা ও প্রতারণা।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ইমরান আয়াত নং ১৬০ এ ইরশাদ করেছেন,

اِنۡ يَّنۡصُرۡكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡ ۚ وَ اِنۡ يَّخۡذُلۡكُمۡ فَمَنۡ ذَا الَّذِىۡ يَنۡصُرُكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِهٖ ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ

অর্থঃ "যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে তোমাদের উপর বিজয়ী কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন তবে কে এমন আছে যে, তোমাদেরকে এর পরে সাহায্য করবে? আর আল্লাহর উপরই যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে"।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই হলো এমন এক জীবন ব্যবস্থা যেখানে ধনী গরীব, শাসক শাসিত সকলের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা হয়।যারা নিজেদের জনসাধারণ থেকে লোকমা কেড়ে নেয়ার বদলে নিজের পেটে পাথর বেঁধে নিজেদের জনসাধারণকে খাবার খাওয়াবে, বিধবা ও মিসকীনদের জন্য নিজের পিঠে বোঝা বহন করে নিয়ে যাবে এবং নিজ হাতে খাবার তৈরী করে খাওয়াবে। যারা রাতের বেলায় মদের নেশায় মাতাল হয়ে নিজের জাতিকে বিক্রি করে দিবে না; বরং রাতের ঘুম বাদ দিয়ে নিজের জাতির জন্য আহাজারী করবে, এই চিন্তায় মগ্ন থাকবে যে, জনগণের মধ্যে কেউ তো ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে যায়নি যে, কেয়ামতের দিন এ কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে।

ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, ইসলামী জীবনব্যবস্থায় শাসক তার অধীনস্থদের ব্যাপারে বা প্রজা ও জনগণের হকের ব্যাপারে একজন খলীফার কীরকম সচেতনতা থাকা উচিত। খলীফাতুল মুসলিমীন উমর (রাঃ) এর একটি ঘটনা নিম্নরূপঃ

“হযরত উমর (রাযি.)-এর খাদেম আসলাম বলেন, একরাতে আমি উমর (রাঃ) এর সঙ্গে বের হলাম এবং মদিনা থেকে দূরে চলে এলাম। আমরা দূরবর্তী বাড়িঘরের অধিবাসীদের খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। হঠাৎ আমরা দূরে আগুন দেখতে পেলাম। উমর (রাঃ) বললেন, 'আসলাম। মনে হয়, সেখানে কোনো কাফেলা আছে, রাত ও শীতের কারণে তারা সেখানে আটকে গেছে। চলো, আমরা সেখানে যাই। আমরা দ্রুতপদে সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম, একজন নারী কয়েকজন শিশুসহ অবস্থান করছে। আগুনের ওপর একটি ডেকচিও বসানো আছে। বাচ্চাদের মা রান্নার ভান করছিলো তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া জন্য। উমর (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে ব্যথিত হলেন, কষ্ট পেলেন এবং তিনি দ্রুতপদে বায়তুল মালে ফিরে আসলেন। বায়তুল মাল থেকে এক বস্তা আটা ও এক পাত্র চর্বি-তেল বের করে তিনি নিজের পিঠে তা বহন করে নিয়ে যেতে লাগলেন। তখন তাঁর খাদেম আসলাম বললো, " আমিরুল মু'মিনিন আমিই আপনার পক্ষ থেকে বহন করছি। খলীফা অসন্তোষকণ্ঠে বললেন, 'আরে হতচ্ছাড়া। তুমি কি কিয়ামতের দিন আমার বোঝা বহন করবে?”
[ইসলামী ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ-১ম খন্ড, মাকতাবাতুল হাসান প্রকাশনী]

ভোট ও তার শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি

খলীফা ও আমীর নির্বাচন পদ্ধতি যেহেতু সাহাবা কেরামের যামানাতেই ছিল, আর তাঁরা হলেন সমগ্র মানব জাতির আদর্শ। সেহেতু ভোট প্রদানের ক্ষেত্রেও তাঁরা আমাদের আদর্শ। তাঁদের আদর্শকে সামনে রেখে ভোট প্রদানকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। যার প্রতিটি বিষয় স্বস্থানে গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দাবীদার। বিষয়গুলি নিম্নরূপ-

১। শাহাদাত (সাক্ষ্য প্রদান)।

২। ওকালাত (প্রতিনিধি নিযুক্ত করা)।

৩। আমানত (একজন ব্যক্তির দায়িত্ব ও অধিকার)।

অর্থাৎ তিনটি বিষয় শাহাদাত (সাক্ষ্য প্রদান), ওকালাত (প্রার্থীকে নিজের প্রতিনিধি বানানো) ও আমানত (একজন ব্যক্তির দায়িত্ব ও অধিকার) এর সমষ্টি হলো ভোট।

১। শাহাদাত (সাক্ষ্য প্রদান):

মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আদর্শবান, সৎ ও খোদাভীরু ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা কর্তব্য। যেহেতু ভোট দেওয়া মানে সাক্ষ্য দেওয়া তাই সত্য ও কল্যাণকে বিজয়ী করা আর মিথ্যাকে পরাভূত করার জন্য সাক্ষ্য দানে অংশগ্রহণ করতে হবে। কেননা সত্য সাক্ষ্য দান থেকে বিরত থাকা মানে মিথ্যাকে বিজয়ী হতে সুযোগ দেওয়া, যা কোনক্রমেই কাম্য নয়। (দ্রষ্টব্য, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া: ৩/৩৫৩ ইসলামিয়া কুতুবখানা, করাচী, পাকিস্তান)

কোন পদের প্রার্থীকে উক্ত পদের জন্য ভোট দেওয়ার মানে হল, ভোটার সাক্ষ্য প্রদান করছে ঐ ভোট প্রার্থীর ধার্মিকতা, ইলম, আমল,তাকওয়ার এবং প্রার্থী যে পদের আশা করছে সে পদের উপযুক্ততার। সুতরাং যদি ভোটপ্রার্থী উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত হয়, তাহলে ভোটারের সাক্ষ্য শরী'আত সম্মত হবে এবং সে সওয়াবের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রার্থীর মাঝে উক্ত গুণাবলী না থাকে, তাহলে তাকে ভোট প্রদান করলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার গুনাহ হবে।

সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে।" (সূরা মায়েদা: ৮)
উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সত্য সাক্ষ্য এড়িয়ে না চলাকে মুসলমানদের উপর ফরয করেছেন। শুধু তাই নয় বরং সত্য সাক্ষ্য গোপন করাকে জুলুম সাব্যস্ত করে বলেছেন-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِن كتم شهادَةً عِندَهُ مِنَ الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থঃ “তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? আল্লাহ তোমাদের খবর সম্পর্কে বেখবর নন। (সূরা বাকারা: ১৪০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন-

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

অর্থঃ “তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে ব্যক্তি তা গোপন করে তার অন্তর পাপী। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে জ্ঞাত" (সূরা বাকারা: ২৮৩)

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۖ

[অর্থঃ "যখন তোমরা কথা বলো, তখন সুবিচার করো, যদিও সে আত্মীয় হয়"। [সূরা আনআম-১৫২]

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور

অর্থঃ "সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো এবং মিথ্যা কথা থেকে দূরে সরে থাকো"। [সূরা আল হাজ্ব-৩০]
হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ: «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ» ثَلَاثَ مِرَارٍ

অনুবাদঃ হযরত খুরাইম ইবনে ফাতিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) একদা ফজর নামায শেষে দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহর সাথে শিরক সমতুল্য অপরাধ। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৫৯৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৭৬০৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২৩৭২]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ

অনুবাদঃ হযরত আবূ বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ সম্পর্কে বলে দিবো না? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা। আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা মিথ্যা কথা বলা। [সুনানে তিরমিজী [বাশশার], হাদীস নং-২৩০১, সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫৯৭৬, ৫৬৩১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৪৩]

২।ওকীল/প্রতিনিধি নিযুক্ত করণঃ

ভোটার তার ভোট দেওয়ার মাধ্যমে জাতির প্রতিনিধি নির্বাচনে, পুরো জাতির পক্ষ থেকে যিম্মাদার হিসেবে রায় পেশ করে থাকে। পুরো জাতির যিম্মাদার হিসেবে উক্ত রায় পেশ করার সময় যদি দলীয় সংকীর্ণতা, স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতি আর কারো প্রতাপের সামনে নতি স্বীকার করে তুলনামূলক যোগ্য ও ইসলামপ্রিয় প্রার্থীকে রেখে অযোগ্য বা দেশ ও ইসলামের জন্য ক্ষতিকর প্রার্থীকে ভোট প্রদান করে, তাহলে জাতির পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে লোকটি খেয়ানতকারীরূপে সাব্যস্ত হবে।

প্রতিনিধি এমন ব্যক্তি হয়, যে প্রতিনিধিত্বের কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে। অনুরূপভাবে ভোটার তার ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রার্থীকে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগের সুপারিশ করে থাকে। আর সুপারিশের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

من يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

অর্থঃ "যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য সেও তার বোঝার একটি অংশ পাবে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।"[সূরা নিসা ৮৫]

সুতরাং নির্বাচিত প্রার্থী ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ভাল-মন্দ যাই করবে প্রত্যেক ভোটার তার নির্বাচিত প্রার্থীর সাথে সওয়াব কিংবা গুনাহে সমান ভাগী হবে।

৩। আমানতঃ

ভোটারের ভোট একটি আমানত। পুরো জাতির পক্ষ থেকে তা সঠিক ও যোগ্য স্থানে প্রয়োগের জন্য তা সংরক্ষিত আমানত। তা অযোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া মানে হল আমানতের খেয়ানত করা। যা খুবই মারাত্মক গোনাহের কাজ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা নিসা আয়াত নং ৫৮ এ ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন আমানতকে তার সঠিক হকদারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আনফাল আয়াত নং ২৭ এ আরো ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে শুনে নিজেদের পারস্পরিক আমানতে খেয়ানত করো না।"

কেন এবং কাকে ভোট দিবেন?

উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, গণতন্ত্র ইসলাম সম্মত নয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কখনোই পরিপূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গুলোর অবস্থা এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে, হুট করেই এ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা যাচ্ছেনা তাই এ ব্যাপারে চেষ্টা ও ফিকির সর্বদা করা উচিত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেহেতু নির্বাচনকালীন সময়ে ভোটের দ্বারাই দেশের নিয়ন্ত্রকদের

জুলুম ও ইসলাম বিদ্বেষী মানসিকতা রুখে দেওয়া অনেকাংশে সম্ভব হয়ে থাকে তাই ভোট দিয়ে সাধ্যানুযায়ী বাতিল শক্তির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করতে হবে। গণতন্ত্র ইসলাম সম্মত নয় বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই।কারণ হাত গুটিয়ে বসে থাকার কারণে যদি ইসলাম বিরোধী শক্তি ক্ষমতায় আসে আর ইসলামের আরো বেশি ক্ষতি করতে শুরু করে দেয় তাহলে এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকা ব্যক্তি আরো বেশি মারাত্মক গোনাহগার হবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় সাধ্যানুযায়ী গোনাহ ও জুলুমকে রুখে দেওয়ার তাকীদ কুরআন ও হাদীসে এসেছে। তাই জাতিকে জুলুম ও নিপীড়ন থেকে বাঁচাতে, সেই সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের জালিম ও ইসলামদ্রোহীর হাত থেকে রক্ষা করতে ভোট প্রদান করা আবশ্যক। কারণ এর দ্বারা অন্তত কিছু হলেও তুলনামূলক ভাল ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে বাতিল শক্তিকে রুখে দেওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে। জুলুম ও ইসলাম বিদ্বেষী কাজ থেকে একদম হাত গুটিয়ে বসে থাকার ব্যাপারে হাদীসে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন-

وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ

অনুবাদঃ হযরত আবূ বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন; যদি লোকেরা জালিম ব্যক্তিকে দেখেও তাকে বাঁধা না দেয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের সবার উপর আযাব নাযিল করে দিতে পারেন। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৩৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৫৩, সুনানে তিরমিজী, [বাশশার] হাদীস নং-২১৬৮, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৩০৫]

নিজের চোখের সামনে জালিম ও ইসলাম বিদ্বেষী নির্বাচিত হয়ে এসে জুলুমের ষ্টীমরোলার মুসলমানদের উপর চালালে, ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে, যে ব্যক্তি নির্বিকার বসে থেকে মাজলুমের সহায়তা না করে, জালিমের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ না করে থাকে, উক্ত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাঞ্ছিত হবে।হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুবাদঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির সামনে কোন মুমিনকে অপমান করা হয়, অথচ তাকে সহায়তা করার ক্ষমতা উক্ত ব্যক্তির থাকা সত্ত্বেও সে তাকে যদি সাহায্য না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সবার সামনে লাঞ্ছিত করবেন। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৫৯৮৫, আলমুজামুল কাবীর লিততাবারানী, হাদীস নং-৫৫৫৪]

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

অনুবাদঃ হযরত জায়েদ বিন খালেদ জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদের বলবো না যে, উত্তম সাক্ষ্য কে? ঐ ব্যক্তি যে, চাওয়া ছাড়াই সাক্ষ্য দিয়ে দেয়। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৭১৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২১৬৮৩, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৫৯৬]

এভাবে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ভোট প্রদানের ব্যাপারটিকে ততটা হালকা মনে করার সুযোগ থাকে না, কার্যত একে যতটা হালকা ভাবা হয়। এক কাপ চা কিংবা নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের বিগলিত অনুরোধে প্রভাবান্বিত হয়ে এই আমানতে খেয়ানত করারও অবকাশ থাকে না। সুতরাং যে ব্যক্তি বা প্রার্থীকে নির্বাচিত করলে ইসলাম সমুন্নত হবে, ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা হবে, দেশের সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, তাকে ভোটের মাধ্যমে বিজয়ী করা সকল জ্ঞানবান ও বিবেকসম্পন্ন ঈমানদার মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।
বাকি সর্বদা চেষ্টা করতে হবে যেন পরিপূর্ণ ইসলামী খিলাফত কায়েম করা যায়। দেশের সর্বস্তরের জনগণকে যদি এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা যায় তবে সেটাই হবে প্রকৃত দেশপ্রেম এবং দেশ ও জনগণের সাথে প্রকৃত ওয়াফাদারি। তুলনামূলক সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিরাও যদি রাষ্ট্র পরিচালনায় আসতে সক্ষম হন তাহলেও দেশ ও জাতি তুলনামূলক

কম ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং এদেশের বঞ্চিত জনতার ভাগ্যে পরিবর্তন সূচিত হবে এ আশা খুব সহজেই করা যায়।

গণতন্ত্রের বাস্তবতা ও মুসলিম উম্মাহের করণীয়

প্রত্যেকেই যদি নিজ আকল দ্বারা একটু চিন্তা ফিকির করে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাদের কী দিয়েছে! তাহলে তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।খেলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্তির পর থেকে এই নতুন ব্যবস্থায় মুসলিম উম্মাহ এতিমের ন্যায় অসহায় জীবন-যাপন করছে। গণতন্ত্র নিজেই যেন এক এতিম সন্তান, যার অভিভাবকত্ব নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি চলছে বিশ্বজুড়ে। যার দরুণ ক্ষমতায় যে আসে কৃত্রিম ভালোবাসা দেখায়, আশ্বাস বাণী শোনায় এবং স্বার্থ উদ্ধার করে চলে যায়। এভাবেই একের পর এক গণতন্ত্রের রঙ্গমঞ্চে নতুন অভিনেতা আসে আর যায় কিন্তু তিমির রাত্রি শেষ হয়না বরং বাড়ে। ক্ষমতার লোভে সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানবরূপী শয়তান বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এদের ভিতর ও বাহির এক নয়। সরল-সিধা সাধারণ মানুষকে প্রতারণায় ভুলিয়ে এই ধরনের দুষ্টু লোকেরাই আজকের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই তন্ত্রের পরবর্তী রূপ হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র, নিজতন্ত্র এবং আমার খুশী মর্জী ইচ্ছার তন্ত্র। এই তন্ত্রে মুসলিম দেশগুলোর শাসন ক্ষমতায় এমন স্বার্থপর ও লুটেরাশ্রেণীকে বসানো হয়েছে যারা স্বজাতির চেয়ে তাদের মনিবদের ভাষা, সংস্কৃতি সভ্যতার অধিক প্রেমিক।যে জাতি ইসলামী খেলাফতের ছায়ায় জীবনযাপন করার কথা তারা আজ জাতিসংঘের কুফুরী শাসনব্যবস্থার অধীনে জীবনযাপন করতে বাধ্য। পশ্চিমাবিশ্ব মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে সহায়তার নামে অভিশপ্ত ও চড়াহারের সুদি ঋণের বোঝা। সুদভিত্তিক বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীনে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয়।

আধুনিকতার নামে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতির সয়লাব ঘটিয়েছে। এর ফলে সাধারণ মুসলমানদের তো কথাই নেই এমনকি শিক্ষিত শ্রেণীও তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার। মুসলমানদের বর্তমান শিক্ষিত শ্রেণীও জানে না ইসলামের প্রকৃত শত্রু কারা। তাই তারা ইসলামের শত্রুকে মিত্র ভেবে তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করে যাচ্ছে।

আর ভুল বোঝাবোঝির কারণে মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুসুলভ আচরণ করছে। এক মুসলিম অপর মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়েছে, এক মুসলিম অপর মুসলিমের হাতে নিহত হচ্ছে। না এটা তো শুধু গোলা বারুদ, কামান, ট্যাঙ্ক, তরবারী, তিরের যুদ্ধ নয়, এ হলো বাক্যের, শব্দের যুদ্ধ, দেশীয় অস্ত্র ও গুলির যুদ্ধ। যা মুসলিমের অন্তর ক্ষত বিক্ষত করে দেয়, মুসলিমের দেহ ঝাঁঝরা করে দেয়।আফসোস নিজেদের মাঝের গৃহ যুদ্ধ দেখে কুফফাররা অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে, যেন তারা এক মুসলিমের সাথে অপর মুসলিমের শরীরে ক্ষত আঘাতের চিহ্ন নয় বরং দেখতে চায় মাইলের পর মাইল মুসলিমদের মাটিতে লুটিয়ে পড়া নিথর দেহ। হায়! এ কোন পথে হেঁটে চলেছি আমরা, এ কোন পথ?????

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আনফাল আয়াত নং ৪৬ এ ইরশাদ করেছেন,

وَ اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ وَ لَا تَنَازَعُوۡا فَتَفۡشَلُوۡا وَ تَذۡهَبَ رِيۡحُكُمۡ وَ اصۡبِرُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ

অর্থঃ "আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধরো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন"।

এ ব্যবস্থায় আল্লাহর কুরআন এতই অবহেলিত ও মূল্যহীন হয়ে পড়লো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানব রচিত গণতান্ত্রিক সংসদ তা মঞ্জুর না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর চিরন্তন সত্য কিতাবের বিধি-বিধান আইনের অংশ হওয়ার উপযুক্ত নয়। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক।
গণতন্ত্রে নেতৃত্বের জন্য কোনরূপ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মানদণ্ড নির্ধারিত না থাকায় সাধারণত অযোগ্য ও অদক্ষ নেতৃত্বের বিস্তার ঘটে। যার প্রত্যক্ষ কুফল ভোগ করে সাধারণ জনগণ।

وَعَن أبي هريرةَ قَالَ: بَيْنَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» . قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে জিজ্ঞাসা করলো, কিয়ামত কখন হবে? উত্তরে হুযূর (ﷺ) বললেন: আমানত যখন নষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, তা কিভাবে নষ্ট করা হবে? তিনি বললেন ; কাজের দায়িত্ব যখন অনুপযুক্ত লোককে দেওয়া হবে তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো। —[বুখারী হা/৫৯]

এইসব গণতান্ত্রিক দেশে সরকারী ও বিরোধী দলের লড়াই-সংঘর্ষ, হরতাল-সন্ত্রাস ও প্রতিপক্ষকে জব্দ করার মানসিকতা সর্বদা বিরাজমান থাকে। ফলে সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিগণ অসম্মানিত হন। যোগ্য ব্যক্তিগণ বিচ্ছিন্ন হন। দলীয়করণ প্রকট আকার ধারণ করে। নির্দলীয় বা অপর দলীয় গুণী ও যোগ্য ব্যক্তিগণের সেবা থেকে প্রশাসন ও জনগণ বঞ্চিত হয়। ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বক্তা ও রাজনৈতিক নেতাদের কদর বেশী হওয়ার কারণে প্রচারবিমুখ যোগ্য, গুণী ও আল্লাহভীরু সৎ লোকদের উপস্থিতি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে থাকেনা বললেই চলে। সর্বোপরি জনমতের কোন স্থিরতা না থাকায় এবং সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থে বা বুঝের কমবেশীর কারণে ঘন ঘন জনমতের পরিবর্তন হওয়ায় গণতান্ত্রিক সংবিধান কখনোই জনকল্যাণের স্থায়ী সংবিধান নয়।

গণতন্ত্রে জনগণের অংশীদারিত্বের কথা বলা হলেও কেবল ভোটের সময় কিছু লোকের ভোট দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন কিছুতেই জনমতের তোয়াক্কা করা হয় না। ফলে অসন্তুষ্ট জনগণ হরতাল-ধর্মঘট, মিটিং-মিছিল, অনশন, গালি-গালাজ, হত্যা, লুণ্ঠন ও ভাঙচুরের পথ বেছে নেয়। এইভাবে গণতন্ত্র অবশেষে ঝগড়াতন্ত্র ও বন্দুকতন্ত্রে পরিণত হয়। যার তিক্ত ফল প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে। বর্তমানে ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও ভোটকেন্দ্র দখলের জন্য সশস্ত্র ক্যাডার ও ভাড়াটিয়া মস্তানদের কদর বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে ভোটের বাক্স ভরে রাখা হচ্ছে। এছাড়া লাখ লাখ ভুয়া ভোটার তৈরী করা হচ্ছে। যাতে আসল ভোটাররা ভোট না দিলেও ভুয়া ভোট দিয়ে সরকারী দল উৎরে যেতে পারে। সেই সাথে যোগ হয়েছে ব্যাপক ঘুষ ও কালো টাকার ছড়াছড়ি। ফলে বর্তমান যুগে গণতন্ত্র জনমত প্রতিফলনের যথার্থ বাহন নয়।

এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই আলেম সমাজকে সমাজের নিম্নশ্রেণী বানিয়ে রেখেছে। পক্ষান্তরে ফাসেক, লম্পটদের দিয়েছে সুশীল, সভ্য ও এলিটশ্রেণীর সম্মান। যে আল্লাহর আইন সম্পর্কে অজ্ঞ তাকে বানিয়েছে বিচারক। অথচ আল্লাহর আইন সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিকে ফায়সালা করার অনুমতিটুকু দেয়নি। এই ব্যবস্থা সম্মানীদের সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছে। স্বাধীনতার নামে সমাজকে অশ্লীলতা, লজ্জাহীনতা আর উলঙ্গপনার আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। চারিত্রিক সম্মানবোধ থেকে বঞ্চিত করেছে। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন নারীদের ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করেছে। যে নারীকে ইসলাম ঘরের রানীর মর্যাদা দিয়েছে, নারীর প্রথম, প্রধান ও আসল কর্মকেন্দ্র তার ঘরকে করেছে সেই নারীকেই এই ব্যবস্থা পুরুষদের ভোগ্য বিনোদনের সামগ্রীতে পরিণত করেছে, কারখানার শ্রমিক বানিয়েছে, নারীর নারীত্ব ধ্বংস করেছে।

সূরা আহযাব আয়াত নং ৩৩ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَ قَرۡنَ فِیۡ بُیُوۡتِکُنَّ وَ لَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ الۡجَاهِلِیَّةِ الۡاُوۡلٰی وَ اَقِمۡنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِیۡنَ الزَّکٰوةَ وَ اَطِعۡنَ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ ؕ

অর্থঃ "আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে"।

অর্থাৎ তোমরা ঘরে অবস্থান করো এবং প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বাইরে যেও না। এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, নারীদের কর্ম রাজনীতি, দুনিয়া পরিচালনা ও পরিশ্রম-উপার্জন করা নয়। বরং তাদের প্রধান কাজ হলো, ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে সুরক্ষিত থেকে গৃহকর্ম দেখাশোনা করা।

মানবতার শত্রু এই ব্যবস্থাই মধ্যবিত্ত শ্রেণী পেশার মানুষদের শান্তির নীড়কে অশান্তির অনলে পরিণত করেছে প্রতিনিয়ত দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির মাধ্যমে। লোকশানের বোঝা মাথায় নিয়ে কারখানা মিল-ফ্যাক্টরীগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ফসলী ভূমি কমতে থাকায় কৃষিশিল্প আজ হুমকির মুখে। কৃষকশ্রেণী চরমভাবে অবহেলিত এই ব্যবস্থায়, ন্যায্য অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আল্লাহর দুশমনদের নাপাক হাতে নির্যাতিত ফিলিস্তিনের গাযা বাসীদের খাবারের জন্য বিশুদ্ধ পানি নেই।ক্ষুধার্ত শিশুদের আহারের জন্য পর্যাপ্ত খাবার নেই, তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করছে তারা। তাদের মাথা গুজার জন্য নিরাপদ কোনো আশ্রয়স্থল নেই। বোমার আঘাতে আসমানে উড়ে বেড়ায় মাসুম ছোট্ট পাখি গুলোর দ্বিখন্ডিত দেহ। লাল টুকটুকে তাজা টগবগে রক্তে রঞ্জিত গাযাবাসীর রাজপথ।

ফিলিস্তিনসহ সকল মাজলুমেরা চিৎকার দিয়ে বলে উঠে,

কোথায় জান্নাতকাঙ্খী পবিত্র জামাত?
কোথায় যুবক-সমাজ?
কোথায় মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ?
কোথায় সৎকাজের আদেশ দাতারা?
কোথায় অন্যায় কাজে বাধা প্রদানকারী?
কোথায় সে মানবতার বাহাদুরী?
কোথায় মুসলিম প্রজন্মের বিবেক- বুদ্ধি?
কোথায় ইজ্জত-সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ?
কোথায় ঘুণে ধরা সমাজের সংশোধনী পদক্ষেপ?
কোথায় জাতির নৈতিক সংগ্রামের জীবনযাপনের প্রস্তুতি?

কোথায়?! কোথায়?! কোথায়?!
আহা! কেউ নেই! আছে শুধু লাশের স্তুপ। আছে শুধু গলায় মানব রচিত আইনের জনকদের গোলামির রশি ।
আরববিশ্ব হচ্ছে ইসলামীবিশ্বের হৃদয়ের স্পন্দন। কিন্তু সেই আরববিশ্ব যেন (আমেরিকা নামক) বিড়ালকে দুধ (ফিলিস্তিন) পাহারায় নিযুক্ত করে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। এতটুকুই নয় বরং ঘুমের কাঁধে চড়ে আমেরিকা ও ইসরাইলের কালো থাবা থেকে নিরাপদ থাকার স্বপ্নও দেখছে। এরূপ অনুভূতি কবি মির্জা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں "সে এখনও স্বপ্নে বিভোর, যে স্বপ্নের মধ্যে জাগ্রত"!

মুসলিম রাষ্ট্রগুলো গণতন্ত্রের জনকদের সামনে তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বুক চেতিয়ে নিজের জান মাল বিনাদ্বিধায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবান যে করবে গাযার মাজলুম ভাই বোনদের জন্য সেই হিম্মত টুকু ও কেড়ে নিয়েছে এই গণতন্ত্র। মেরুদন্ড ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। ভোগবিলাসিতায় ব্যস্ত করে রেখেছে। এত কিছুর পরেও যদি কেউ এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সম্মান প্রর্দশন করতে চায় এবং এর প্রতি দরদ ভালোবাসা দেখাতে চায় তাহলে সে যেন হাশরের ময়দানে পরাক্রমশালী রবের মুখোমুখি হয়ে জবাবদিহীতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রাখে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ও সূক্ষ্ম হিসেবগ্রহণকারী।

সূরা বাকারা আয়াত নং ২০২ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَ اللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ
অর্থঃ "তারা যা অর্জন করেছে তার হিস্যা তাদের রয়েছে। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী"।

গণতন্ত্রের ক্ষমতাশীলদের সন্তানেরা দৈনিক মুখরোচক খাবারের পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করে। পানির পরিবর্তে পান করে হরেক রকম কোমল পানীয় । যারা শৈশব থেকে কখনো ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেনি তারা ক্ষুধার্তদের কষ্ট অনুভব করবেই বা কি করে? চারদিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কল্যাণে চরম পর্যায়ের সিন্ডিকেট বিরাজ করে, চড়ামূল্যে ক্রয় করতে হয় সবকিছু। তাহলে কী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জনগণেরা মানুষ নয়? তারা কি এই জাতির মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া কোন কীট-পতঙ্গ?

এই গণতন্ত্রে সাধারণ জনগণ নিজেদের অধিকার চাওয়ার জন্য রাস্তায় বের হলে জুলুম নির্যাতনের স্বীকার হয়।লাশ পড়ে জনগণের আর ক্ষমতায় যায় মুষ্টিমেয় শাসক শ্রেণী! জন সাধারণের ঘরে খালি অন্ধকার আর অন্ধকার। আর ক্ষমতাসীনদের অট্টালিকাগুলো এমন আলোকিত যে গরীবদের চোখ ঝলসে যায়...! মানব রচিত গণতান্ত্রিক আইনে

সাধারণ জনগণ হয় লাঞ্ছিত, অপমানিত। ব্যাংক, ঘর-বাড়ি থেকে এবং মহিলাদেরকে অলংকার থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। এরা ঐ শ্রেণী যারা ভূমিকম্প ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের জন্য আসা সাহায্যকেও নিজেরা খেয়ে ফেলে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরনো চেহারা চলে যাওয়া ও নতুন চেহারা আসার দ্বারা জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট শেষ হয়ে যাবে? প্রত্যেকের একথা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার যে, নতুন আওয়াজ ও নতুন চেহারা আসার দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্রের ভাগ্য বদলাবে না; বরং যদি কোন নতুন চেহারাধারী এই দুর্গন্ধযুক্ত ব্যবস্থার কথা বলে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, সে নতুন আরেক ডাকাত। সকল অনিষ্টতার মূল হলো এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা ইসলামের শত্রু, দ্বীনের শত্রু, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শত্রু, পুরো মানব জাতির শত্রু।

গণতন্ত্র পুরো বিশ্বজুড়ে উপহার দিয়েছে যুদ্ধ আর লাশ।দুনিয়া যেন লাশের স্তূপ। ১৯৮৯-২০২৪ পর্যন্ত শুধু যুদ্ধে মৃত্যু ৩৯ লক্ষ এর অর্ধেক আফ্রিকায়। এর মধ্যে অনেক যুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জড়িত। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ২০১৩ সালের ৫ ই মে উপহার দিয়েছে শাপলা চত্বরের গণহত্যা। আর বিভিন্ন সময় দিয়েছে হত্যা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যুদ্ধে আনুমানিক নিহতদের পরিসংখ্যানের বৈশ্বিক জরিপঃ

যুদ্ধ/ঘটনা	**সময়কাল**	**জড়িত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র**	**আনুমানিক মৃত্যু**	**সূত্র**
১ম বিশ্বযুদ্ধ	১৯১৪-১৯১৮	ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি,USA	১.৬ কোটি সৈন্য+ বেসামরিক	WWI মোট মৃত্যু ৪ কোটির ৪০%
২য় বিশ্বযুদ্ধ	১৯৩৯-১৯৪৫	ব্রিটেন,ফ্রান্স,USA	৫-৭ কোটি	WW2
কোরিয়া যুদ্ধ	১৯৫০-১৯৫৩	USA, দক্ষিণ কোরিয়া vs উত্তর কোরিয়া	৩০ লক্ষ অর্ধেক বেসাময়িক	UCDP

ভিয়েতনাম যুদ্ধ	১৯৫৫-১৯৭৫	USA, দক্ষিন কোরিয়া	৩৫ লক্ষ-২০ লক্ষ বেসামরিক	Rummel.vietnam
বাংলাদেশ যুদ্ধ	১৯৭১	পাকিস্তান-সামরিক, ভারত-গণতন্ত্র	৩ লক্ষ, মতান্তরে ৩০ লক্ষ	Rummel
ইরাক যুদ্ধ	২০০৩-২০১১	USA,UK জোট	৪৬ লক্ষ-১০ লক্ষ বেসামরিক	Lancet Study
আফগানিস্তান	২০০১-২০২১	USA, NATO	২.৪ লক্ষ-৭১০০০ বেসামরিক	Brown University
ক্লোন হামলা	২০০৪-২০২৪	USA	৮৫০০-১৬০০০, ১০% শিশু	Bureau of Investigative journalism
ইসরাইল- গাজা	২০০৮-২০২৪	United states	প্রায় ৬২০০০+ গাজায়, ৭৭০০ শিশু শুধ ২০২৩ এ	UN
রাশিয়া-ইউক্রেন	২০১২-২০২৪	ইউক্রেন-গণতন্ত্র, রাশিয়া-অগণতান্ত্রিক	৫ লক্ষ সৈন্য,১০০০০+ বেসামরিক	US intelligence

গণতন্ত্রের নামে বেসামরিক হত্যা — গবেষণা কী বলে?

Belfer Center, Harvard গবেষণা ২০০৭: "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি বেসামরিক মানুষ মারে। গণতন্ত্র ৫০,০০০+ বেসামরিক হত্যার সম্ভাবনা বেশি রাখে"

কারণ:গণতন্ত্র "যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করে" এবং "বোমা মেরে জিততে চায়"। হিরোশিমা, নাগাসাকি, ড্রেসডেন, টোকিও — সব গণতান্ত্রিক বোমা।

তাছাড়া ফিলিস্তিন, গাজা, সিরিয়াতেও সব গণতান্ত্রিক বোমা।

পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, নিশ্চয়ই ইসলাম হলো সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বে মানুষকে ফিরিয়ে আনা আর গণতন্ত্র হলো সৃষ্টির দাসত্ব করা, যার বুকে আছে কুফুরের সিল; যেখানে লাঞ্ছনাকে বলা হয় সম্মান ও গোলামিকে বলা হয় স্বাধীনতা। এই তন্ত্রে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর স্বার্থের হেফাজত হয় শুধু। যারা সাধারণ জনগণকে গরু ভেড়া বকরীর ন্যায় হাঁকিয়ে বেড়ায় শুধু। গণতন্ত্রের কাজ ই হচ্ছে সাধারণ জনগণকে বেকুব বানিয়ে ক্ষমতাশীলদের আরো ক্ষমতাশালী বানানো, এ হলো গণতন্ত্রের কীর্তি। পক্ষান্তরে জীবনের সব ক্ষেত্রে, সব বিষয়ে মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব ও বিধানদাতা মেনে নেওয়াই ইসলাম শিক্ষা দেয়। আল্লাহর কাছে একান্ত আত্মসমপর্ণ করা ছাড়া মানুষ কখনো মুক্ত হতে পারে না, কখনো সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। সার্বভৌমত্ব এক আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। যে তাঁর আনুগত্য ভাগ করে একভাগ আল্লাহকে দেয়, আরেক ভাগ অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করে, সে বিশ্বাসী হতে পারে না। আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা একমাত্র আল্লাহর প্রতি। এই উপলব্ধি ছাড়া মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। আল্লাহর আইনের বাস্তবায়ন এবং সে অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। এটি আল্লাহর গোলামি ও দাসত্ব এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার অনিবার্য দাবী। আল্লাহর আইন থেকে পরিপূর্ণ অথবা তার কোন অংশ থেকে বিমুখ হওয়া আল্লাহর আযাব ও শাস্তির কারণ হবে। এ কথা সকল যুগ ও স্থানের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ভাবে প্রযোজ্য তেমনি ভাবে মুসলিম সমাজের জন্যও প্রযোজ্য। মত বিরোধের ক্ষেত্রে তা দু'দেশের মধ্যে হোক বা দু'দলের বা দু'জনের মধ্যেই হোক, সব অবস্থাতেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কেননা সৃষ্টি যেমন আল্লাহর, আইনও বিধান দেওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

অতএব সকল সাধারণ মুসলিম ও শাসকশ্রেণীর উপর ওয়াজিব হল, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে, নিজেদের দেশে আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠিত করে। শাসকরা যেন নিজেদেরকে এবং নিজেদের অধীনস্থদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর আইন থেকে বিমুখ হওয়ার বিভিন্ন দেশে যা ঘটছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। পাশ্চাত্যের অনুসরণ করার ফলে সেখানে কি ঘটছে? মত-বিরোধ,

দলাদলি, হাঙ্গামা, বিপর্যয়, শাস্তি ও কল্যাণের অভাব, একে অপরকে হত্যা ইত্যাদি। আল্লাহর আইনের দিকে প্রত্যাবর্তন না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে থাকবে। মহান রব্বুল আলামীনের আইনের পরিবর্তে দুর্বল মানুষের গড়া আইনকে মুসলিমরা গ্রহণ করে নিয়েছে। এর চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে যার কাছে আল্লাহর কালাম আছে যা সত্যের ঘোষণা দিচ্ছে, বিভিন্ন সুস্পষ্ট বর্ণনা পেশ করছে, সঠিক পথ দেখাচ্ছে এবং পথভ্রষ্টকে পথের সন্ধান দিচ্ছে অথচ সে কুরআনকে বাদ দিয়ে কোন মানুষের কথাকে অথবা কোন দেশের আইনকে গ্রহণ করছে। তারা কি জানেনা যে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে? দুনিয়াতে তারা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না এবং আখিরাতে আল্লাহর কঠিন শাস্তি ও আজাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না; কারণ তারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়কে হালাল করেছে এবং যা তাদেরকে করতে বলা হয়েছে তা তারা বর্জন করেছে। দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক মোহের পরিণতি কি হতে পারে সেটি নিম্নোক্ত হাদিসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) হযরত আমর ইবনে আউফ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

فَوَاللَّهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ
كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

অনুবাদঃ “আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের আশঙ্কা করছি না। বরং আমি আশঙ্কা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেভাবে দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল, তোমাদের উপরও সেভাবে দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। তারপর তোমরা দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে, যেভাবে তারা লিপ্ত হয়েছিল। আর দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করে দিবে, যেভাবে তাদের ধ্বংস করেছিল।” [সহীহ বুখারী, হা/৩১৫৮ ,সহীহ মুসলিম, হা/২৯৬১]

আফসোস, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লোকেরা যদি বুঝত তারা কি মূল্যবান সম্পদ হারিয়েছে, কত বড় অপরাধ তারা করেছে। কি কারণে তারা আপন আপন জাতির উপর বিপদ

মুসিবত ডেকে এনেছে! আল্লাহ তা'আলা সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত নং ৪৫ এ ইরশাদ করেছেন,

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

অর্থঃ "প্রকৃত কথা এই যে, এ কিতাব তোমার জন্য এবং জাতির জন্য নসীহত ও উপদেশের বিষয়। আর অতি শীঘ্র তোমাদেরকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে"।

এমতাবস্থায় মুসলিমের দায়িত্ব হলো পুরো বিশ্বের কাছে বার্তাগুলো পৌঁছে দেওয়া যে,

মুফতী মুহাম্মাদ ইসহাক সিদ্দীকী নদভী (রহঃ) তার লেখনীতে বলেছেন,

مسلم خوابیدہ اٹھ ، در ماں بکن چارہ بساز ایک عالم تیری جانب دیکھتا ہے بار بار

অর্থঃ জাগো হে ঘুমন্ত মুসলিম! বিশ্বকে বিপদমুক্ত করো; গোটা বিশ্ব তোমার পানে চেয়ে আছে।

সূরা হা- মীম-সিজদাহ আয়াত নং ৩৩ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

অর্থঃ "আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায় এবং সৎকাজ করে। আর বলে, 'অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত"।'

সূরা আল মায়িদা আয়াত নং ২ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا
عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ

অর্থঃ "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করো। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর"।

সূরা আল যিলযাল আয়াত নং ৭ ও ৮ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ، وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

অর্থঃ “অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালকাজ করলে তা সে দেখবে,
আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে”।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا " .

অনুবাদঃ ইয়াহয়া ইবনে আইয়ুব, কুতায়বা ইবনে সাঈদ ও ইবনে হুজর (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহবান জানায় তার জন্য সে পথের অনুসারীদের সওয়াবের অনুরূপ সওয়াব রয়েছে। এতে তাদের সওয়াব থেকে কিছুমাত্র ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহবান জানাবে তার উপর তার অনুসারীদের গুনাহের অনুরূপ গুনাহ বর্তাবে। এতে তাদের গুনাহ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না। [সহীহ মুসলিম, হা/ ৬৫৬০]

آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ؛ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

অনুবাদঃ হারিস আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি; আল্লাহ আমাকে এগুলি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন: (১) জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা (২) আমীরের আদেশ শ্রবণ করা (৩) তার আনুগত্য করা (৪) (প্রয়োজনে) হিজরত করা এবং (৫) আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আর যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করলো, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান জানালো, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হলো। যদিও সে সিয়াম পালন করে ও সালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম। [সুনানে আত তিরমিজী হা/২৮৬৩, মুসনাদে আহমাদ,হা/১৭১৭০]

আল্লাহ তা'আলা সূরা রদ আয়াত নং
১১ এ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا قلے مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোন জাতির মন্দ চান, তখন তা প্রতিহত করা যায় না এবং তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক নেই"।

সূরা আনফাল আয়াত নং ৫৩ এ আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন,

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ "তা এ জন্য যে, আল্লাহ কোন নিয়ামতের পরিবর্তনকারী নন, যা তিনি কোন কওমকে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা পরিবর্তন করে তাদের নিজেদের মধ্যে যা আছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ الأَعْرَجَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ ". وَبِهَذَا الإِسْنَادِ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْه." ُ ِ

অনুবাদঃ আবুল ইয়ামান (রহঃ) .... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে বলতে শুনেছি, আমরা সর্বশেষে আগমনকারী (পৃথিবীতে) সর্বাগ্রে প্রবেশকারী (জান্নাতে)। আর এ সনদেই বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমার নফরমানী করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলারই নাফরমানী করল আর যে ব্যক্তি (শরী'আত স্বীকৃত) আমীরের আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল সে ব্যক্তি আমারই নাফরমানী করল। ইমাম তো ঢাল স্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ এবং তাঁরই মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা হয়। যদি সে আল্লাহর তাকওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার জন্য এর প্রতিদান রয়েছে আর যদি সে এর বিপরীত করে তবে এর মন্দ পরিণতি তার উপরই বর্তাবে। [সহীহ বুখারী হা/ ২৭৫১]

হুযাইফাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ! لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُم.ْ

অর্থঃ''সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা অবশ্যই একে অপরকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ শাস্তি পাঠাবেন। তখন তোমরা তাঁকে ডাকবে; অথচ তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন না''। [সুনানে তিরমিযী, হা/২১৬৯]

এই হাদিসের সাথে বর্তমান অবস্থার পুরোপুরি মিল পাওয়া যায়। মুসলিম উম্মাহ এসব থেকে দূরে সরে এসেছে। সৎকাজের আদেশ নেই, যার কারণে সুদ, মদ,বেপর্দা, যিনা সব চলছে। বাধা দিলে "জঙ্গি" "সন্ত্রাসী" ট্যাগ। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, গুম, খুন, বিচারহীনতা সব রয়েছে। যারা আল্লাহর আইন মানে না, তারাই ক্ষমতায়। দোয়া কবুল হয় না: লাখ লাখ মানুষ তাহাজ্জুদ পড়ে দোয়া করছে, তবুও ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

কারণ কী? মুসলিম উম্মাহ শর্ত পূরণ করেনি। আমর বিল মা'রূফ (সৎকাজের আদেশ) ও নাহি আনিল মুনকার (অসৎ কাজের নিষেধ) ছেড়ে দেওয়ার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে।

সমাধান তাহলে কী? সমাধান হলো তাগুতকে বর্জন করতে হবে। "অবশ্যই সৎকাজে আদেশ দিতে হবে" ও "অসৎ কাজে নিষেধ করতে হবে" । নিজে শরী'আত মানতে হবে, পরিবারকে মানার তাগিদ দিতে হবে, সমাজে দাওয়াতি কাজ করতে হবে এবং খেলাফতের জন্য কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-বাকারা আয়াত নং ২৫৬ এ ইরশাদ করেছেন,

فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ "অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"

সূরা যুমার এর ১৭নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

অর্থঃ "যারা তাগুতের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে আসবে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, অতএব, আপনি আমার বান্দাকে সুসংবাদ দিন"।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان. "
]رَوَاهُ مُسْلِم.[

অনুবাদঃ আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় দেখলে তা সে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, তাও যদি না করতে পারে তাহলে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করবে। আর এ হচ্ছে (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) দুর্বলতম ঈমান।"
[সহীহ মুসলিম: ৪৯, হাদিসের মানঃ সহিহ]

সূরা আত তাওবা আয়াত নং ১৬ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جُهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থঃ "তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত"।

সূরা আল ইমরান আয়াত নং ১১০ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

অর্থঃ "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে"।

এই আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ উম্মত গণ্য করা হয়েছে এবং তার কারণ কি তাও বলে দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, ভাল কাজের আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখা। অর্থাৎ, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যদি এই (ভাল কাজের আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখার) বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তারা শ্রেষ্ঠ উম্মত। অন্যথা এই উপাধি থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

সৎ কাজের আদেশ না দেওয়া ও অসৎ কাজের নিষেধ না করার ব্যাধির পাশাপাশি উম্মাহর আরো ব্যাধি রয়েছে। সেগুলো হলোঃ

১. ইসলামের প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে অনবগতি।

২. মুসলমানদের অনৈক্য।

৩. দুনিয়াপ্রীতি ও বিলাসী জীবনযাপন।

৪. জিহাদ বর্জন।

৫. জিহাদের বাহ্যিক প্রস্তুতি গ্রহণে অবহেলা।

৬. মুসলমানদের নেতৃত্ব সংকট।

৭. শত্রুকে মিত্র বানানো।

৮. হতাশা ও মনোবলহীনতা।

৯. অযোগ্যকে দায়িত্ব প্রদান করা।

১০. পরামর্শ বর্জন করা।

উম্মাহর এই ব্যাধি গুলো দূর করার জন্য নিম্নোল্লিখিত বিষয়াবলী বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

(১) নিজের মন-মানসিকতা কে ইসলামের হৃদয়গ্রাহী শিক্ষার ধাঁচে সুসজ্জিত করতে হবে এবং নতুন প্রজন্মকে দ্বীনি শিক্ষা দিতে হবে। মুজাহিদ তৈরির জন্য কাজ করতে হবে কারণ আর যাই হোক, হঠাৎ করে মুজাহিদ সৃষ্টি হয় না। সেইসাথে যুব সমাজকে সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং ইসলামের জন্যে জীবন-মরণ উৎসর্গ করার প্রেরণা ও আবেগ সৃষ্টি করা। আর অন্তরে আল্লাহ ও আখিরাতের ভীতি সৃষ্টি করা। এর জন্য প্রয়োজন সুদক্ষ প্রশিক্ষক ও সুযোগ্য অভিভাবক এবং এর বাস্তবায়নে উলামায়ে উম্মতের ভূমিকা শিরোধার্য। এর পাশাপাশি যথাযথ পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

সুলতান সাইফুদ্দীন কুতয (রহঃ) বলেছিলেন-

يَا أُمَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ لِلْإِسْلَامِ إِنْ لَمْ نَكُنْ نَحْنُ

“হে মুসলিম নেতৃবৃন্দ, কে ইসলামের তরে লড়বে, যদি আমরা না লড়ি?"

(২) শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে তা থেকে আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতার বিষাক্ত বিষয়াবলী দূর করতে হবে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে শিক্ষাব্যবস্থার দুর্দশার এক নির্মম চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মূলত উপযুক্ত কর্মজীবী এবং দক্ষ কর্মচারী তৈরির মাধ্যম মাত্র। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শিক্ষা সংস্কৃতিতে দীর্ঘকাল ধরে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির অনুসরণের ফলে দেশে দেশে মুসলিম তরুণেরা পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণায় গড়ে উঠেছে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে এরাই পাশ্চাত্যের জীবনধারাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করে বহু আগেই আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) বলেছিলেন, "ধর্মহীন কর্মশিক্ষা আর কর্মহীন ধর্মশিক্ষা” জাতির জন্যে বোঝা।

(৩) মিডিয়াকে শুধু চিত্ত-বিনোদনমূলক উপকরণ না বানিয়ে মুসলিম মানসিকতা গঠনে ব্যবহার করতে হবে।
নিজ নিজ জায়গা থেকে প্রত্যেককে দায়ীর ভূমিকা পালন করা এবং দেশে সত্যিকার অর্থে ইসলাম কায়েম করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে ।

(৪) অন্যায় ও বে-ইনসাফের অবসান করতে হবে। যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির কাজ করতে হবে। কেননা ওয়াজ নসিহত ও বক্তৃতার চেয়ে যোগ্য নেতৃত্বের প্রভাব বহুগুণ বেশি। যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

(৫) অশ্লীলতা ও নগ্নতাসহ যাবতীয় ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। প্রতিটি ঘরে ঘরে ইসলামী সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

(৬) উম্মাহর ব্যাধি দূরীকরণের যাত্রায় হতাশ হওয়া যাবেনা।মনোবল হারানো যাবেনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউসুফ আয়াত নং ৮৭ এ ইরশাদ করেছেন,

وَ لَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللهِ ۚ اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

অর্থঃ "আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না" ।

উল্লেখ্য, তথাকথিত গণতন্ত্র ইসলামবিরোধী প্রচার-প্রপাগান্ডা সব সময়ই করে আসছে। এই বস্তুবাদী মানব রচিত গণতন্ত্রের নোংরামী থেকে কোন মুসলিম দেশকে মুক্ত ও পবিত্র রাখতে পারলে এবং সেখানে উপরোল্লিখিত বিষয়াদির সঠিক বাস্তবায়ন করলে সে দেশের ঐক্য, স্থায়িত্ব, উন্নতি, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত এবং অবশ্যম্ভাবী। শুধু বিক্ষোভ প্রদর্শন ও তির্যক বক্তব্যের দ্বারা গণতন্ত্রের রক্ত পিপাসুদের ওপর কোন প্রভাব পড়বে না। খেলাফত যিন্দা করার বিকল্প নেই, খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা এটা এই উম্মতের ওপর শুধু মুস্তাহাব বা সুন্নাত নয়; বরং ফরজ। খেলাফত ছাড়া এই উম্মত এতিম, নিঃস্ব। মুসলমানদের বোঝা উচিত যে, 'জিহাদ' শব্দটি কোনো দোষণীয় শব্দ নয়, যা লুকিয়ে রাখতে হবে বা তা প্রকাশে লজ্জা পেতে হবে। 'জিহাদ' এমন কোনো নিকৃষ্ট

শব্দ নয়, যা শিক্ষাসিলেবাস, পত্র-পত্রিকা, বই-পত্র, কিতাবাদি থেকে মুছে ফেলতে হবে। জিহাদ তো ইসলামের শীর্ষ চূড়া। জিহাদ ইসলামের অন্যতম প্রধান আমল। ইসলামের শত্রু কিংবা ভাব শত্রুরা তা মানুক বা না-মানুক।

সূরা আল বাকারা আয়াত নং ২৬১ এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

অর্থঃ "যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ"।

মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃত সত্য ও কল্যাণ কেবল ইসলামেই নিহিত রয়েছে। যুগে যুগে পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হলেও মানব চরিত্রের কোন পরিবর্তন নেই। সে কারণে ইসলামের মৌলিক বিধান সমূহ অপরিবর্তনীয়। অতএব মানবরচিত বিভিন্ন মতবাদ যা কুরআন ও সুন্নাহর সত্য বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, তা যতই আপাতমধুর হৌক না কেন, মুমিন তা কখনোই মেনে নিতে পারে না। কবে হৃদয় কোণে লুকিয়ে থাকা সুপ্তবীরত্ব তীব্রাকার ধারণ করবে? কবে ?! আল্লাহ আমাদের সত্য অনুসরণের তাওফীক দান করুন- আমীন!

আলোচনার পরিসমাপ্তিতে “ইসলাম ও গণতন্ত্র” বিষয়ে লেখকের নিজস্ব কাব্যিক অভিব্যক্তিটি প্রণিধানযোগ্য: এই পংক্তিতে লেখক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহিংস পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে খেলাফত ব্যবস্থার পক্ষে নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।”

গণতন্ত্রে নেই কোনো সুখ,
অঙ্গজুড়ে তার বেজায় অসুখ
তন্ত্র মন্ত্র দিয়েছে টা কী?
পুরো বিশ্বজুড়ে রক্তের নদী।
এর উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে
ক্ষমতাশীলদের গদি।
গণতন্ত্র কি পেরেছে ন্যায়বিচার এনে দিতে?
গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত ও তীব্র শীতে!

ওহে আল্লাহর বান্দারা!
ওহে রাসূলের উম্মাতেরা!
সময় থাকতে চোখদুটি খোলো,
তন্ত্র মন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলো;
খেলাফত জিন্দা করো।
যেদিন একযোগে প্রতিধ্বনি হবে, গণতন্ত্রের ফাঁসি চাই,
বিশ্বশান্তি ফেরার সুযোগ পাবে, দেখে নিও সবাই।

[লেখককতৃক রচিত, অপ্রকাশিত]

তথ্যসূত্র এবং সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। কুরআনুল কারীম

২। হাদীস গ্রন্থসমূহ (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম,সুনান আবু দাউদ, জামে আত-তিরমিযী)

৩। তাফসীর গ্রন্থ সমূহ(তাফসীর গ্রন্থ ইবনে কাছির, তাফসীর শাস্ত্র ফাতহুল কাদীর, তাফসীরে তবারী)

৪। ইসলামের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ-১ম খন্ড(মাকতাবাতুল হাসান প্রকাশনী)

৫। সীরাতে ইবনে হিশাম

৬। কিতাবুল ফিকহ-২য় খন্ড(ইসলামিক অনলাইন মাদরাসা)

৭। ইসলাম ও গণতন্ত্র-মাওলানা আসেম ওমর

৮। নেদায়ে তাওহীদ-আবু উমার আল মুহাজির

৯। ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূলনীতি-সাইয়্যিদ কুতুব (রহঃ)

১০। ইসলাম ও গণতন্ত্র-ড.ইউসুফ আল কারযাভী, প্রফেসর খুরশিদ আহমাদ

১১। ইসলাম ও গণতন্ত্র একটি বির্তক- মুফতী আব্দুর রহমান সাত্তী (হাফি)

১২। ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদভী

১৩। দরসুল ফিকহ- ১ম খন্ড- মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন শেরপুরী

১৪। ওয়েবসূত্র-(মাসিক আলকাউসার,আহলে হক্ব মিডিয়া সার্ভিস, উইকিপিডিয়া, আল জাজিরা, ইউএন-জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)

১৫। ইসলাম ও আধুনিক রাজনীতি-মুফতী তকি উসমানী

১৬। ইসলাম ও গণতন্ত্র: দুটি জীবনাদর্শের সংঘাত-মুহাম্মাদ আজিজুল রহমান খান

১৭। ইসলামী আইন বনাম মানবরচিত আইন- আবদুল কাদির আওদাত শহীদ (মিসর)

১৮। আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন এবং এর পরিপন্থী বিষয় বর্জনের অপরিহার্যতা-আল শাইখ আব্দুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায

১৯। ইসলামী জাগরণের রুপরেখা-সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)

২০। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে উলামায়ে দেওবন্দ-মাওলানা ইবরাহীম হুসাইন দাঃ বাঃ

২১। ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

২২। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শূরায়ী নিজাম-মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

২৩। তাতারীদের ইতিহাস-ড.রাগিব সারজানি
২৪। খেলাফত ও রাজতন্ত্র-সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী